দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

প্রাচীন হিন্দু সমাজে লিঙ্গবৈষম্য ছিল না
— পৃঃ ২৬

করোনা নিয়ে মমতার মতো রাজনীতি করেন না মোদী
— পৃঃ ২৯

৭৩ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা।। ৩ মে, ২০২১।। ১৯ বৈশাখ - ১৪২৮।। যুগাব্দ ৫১২৩ ।। website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা, ১৯ বৈশাখ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

৩ মে - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

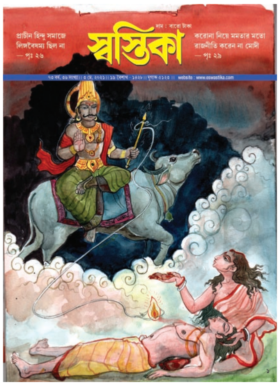

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়— ৫

এত দফায় ভোট চাই, একখামে দুই চিঠি— সন্দর মৌলিক —৭

রবীন্দ্র-অনুধ্যানে হিন্দুত্ব ও হিন্দু সভ্যতা— অমিত দাস —১০

পরীক্ষা নামক অক্সিজেন বন্ধ হলে পরিণাম হবে ভয়ংকর— সাধন কুমার পাল —১৩

করোনাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন মমতা— হীরক কর —১৫

মাননীয়া করোনা নিয়ে রাজনীতি করবেন না— বিশ্বপ্রিয় দাস —১৮

‘ভারতবর্ষে নারী নির্যাতনে শীর্ষে যোগী রাজ্য’ : বাস্তব নাকি অপপ্রচার ?— ড. প্রসেনজিৎ কর —২৩

প্রাচীন হিন্দু সমাজে লিঙ্গবৈষম্য ছিল না— দেবযানী হালদার —২৬

করোনা নিয়ে মমতার মতো রাজনীতি করেন না মোদী— জাহ্নবী রায় —২৯

ভারতবাসীর কাছে মহাবীর হনুমানও শ্রীরামচন্দ্রের মতোই পূজনীয়— গোপাল চক্রবর্তী — ৩১

একুশ শতকেও গুরু তেগবাহাদুরজী সমান প্রাসঙ্গিক— দত্তাত্রেয় হোসবলে —৩৪

বাংলাদেশকে মৌলবাদীরা ক্রমশ গ্রাস করছে— রঞ্জন কুমার দে— ৩৫

গ্রামের ভোটকেন্দ্রে বৃদ্ধার প্রশ্ন, ‘ভোটটা কুথায় দিব বুঝতে পারছি নাই’— গৌতম কুমার মণ্ডল —৩৭

হিন্দু নারীবাদ ও পৌরাণিক পঞ্চকন্যা— স্মৃতিলেখা চক্রবর্তী—৪৩

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ ধর্মপুরুষার্থ ও শিক্ষা— ইন্দুমতী কাটদরে —৪৫

দূষণমুক্ত পৃথিবীই ‘বসুন্ধরা দিবস’ পালনের উদ্দেশ্যে— সরোজ চক্রবর্তী —৪৮

বুদ্ধিজীবী সংজ্ঞার নতুন ধাপ— হিরণ্ময় ব্রহ্মচারী —৫০

নিয়মিত বিভাগ :

পুস্তক প্রসঙ্গ : ৮-৯, **চিঠিপত্র** : ১৯-২০, **অঙ্গনা** : ২১, **সুস্বাস্থ্য** : ২২, **অন্যরকম** : ৩৯, **নবাঙ্কুর** : ৪০-৪১, **চিত্রকথা** : ৪২

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি--- বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

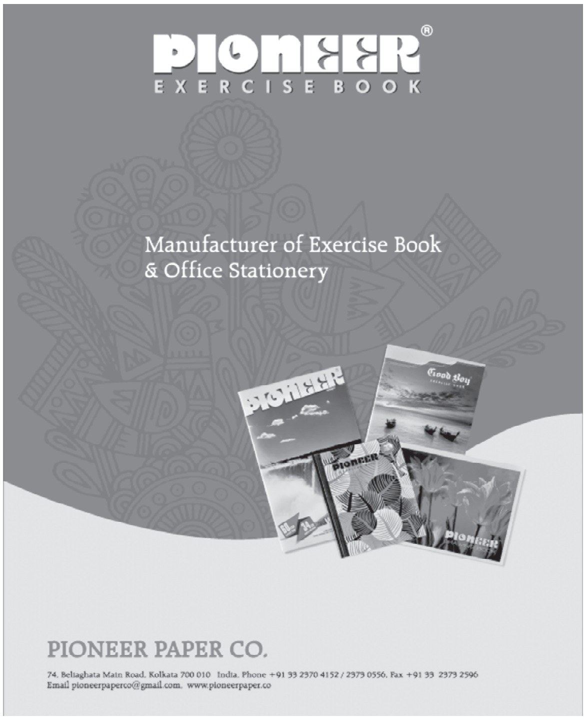

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :
AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-700 071**

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

করোনা লইয়া রাজনীতি মানুষ সহ্য করিবে না

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারী সমগ্র বিশ্বকেই ভয়ানক সংকটের সম্মুখীন করিয়াছে। গত বৎসরে ইহার প্রাদুর্ভাবের সময় হইতেই প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান ও নেতৃত্বে দেশবাসী অত্যন্ত সচেতনতার পরিচয় দিয়াছে। করোনা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব ও সদিচ্ছা দেশবাসীর মনোবল বৃদ্ধি করিয়াছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান-সহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরাও নরেন্দ্র মোদী ও তাঁহার সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছে। বড়ো কথা হইল, সেই সময় সরকারের পাশাপাশি দেশের সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্থাগুলিও করোনা মোকাবিলায় নানাভাবে সহযোগিতা করিয়াছে। ইহার কারণে প্রথম দফা আক্রমণের মোকাবিলায় দেশ সফল হইয়াছিল। আরও বড়ো কথা হইল, আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া ভ্যাকসিন তৈয়ারি করিয়াছেন। ইহার ফলে সমগ্র দেশে টিকাকরণের কাজও চলিতেছে। ইহার মধ্যেই করোনার দ্বিতীয় দফার ঢেউ আরও বহুগুণে ভয়াবহ রূপে দেখা দিয়াছে। প্রথম দফায় একজন করোনা রোগী হইতে ৪০-৫০ জন সংক্রমিত হইত কিন্তু দ্বিতীয় দফায় ইহা ৮০-৯০ জনকে সংক্রমিত করিতেছে। তাহা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া ইহার মোকাবিলায় নামিয়াছে। কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের পাশাপাশি সামরিক বাহিনীকেও কাজে লাগানো হইয়াছে। প্রথমবারের মতো এইবারও সমগ্র দেশ কেন্দ্র সরকারের পাশে রহিয়াছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল, এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কয়েকটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের রাজনীতিকরা অতি নিম্নরুচির রাজনীতিতে মাতিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এত নীচে নামিয়াছেন যে, তিনি দ্বিতীয়বারের করোনা প্রাদুর্ভাবকে 'মোদী মেড' বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। অন্যান্য রাজ্য যখন করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিয়াছে, তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুধু প্রধানমন্ত্রীকে দোষারোপ করিয়াই চলিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও ভয়াবহ। প্রথম দফা আক্রমণের পর মমতা ব্যানার্জি যথেষ্ট সময় পাইয়াও করোনা মোকাবিলায় কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া কেবলমাত্র ভোটবৈতরণী পার হইবার চিন্তায় সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। রাজ্যে অক্সিজেন ঘাটতির জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকেই দোষারোপ করিতেছেন। অথচ গত জানুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী কেয়ার ফান্ডের টাকায় দেশে ১৬২টি অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসাইবার জন্য ২০১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে দিল্লির জন্য ৮টি এবং পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৫টি ধার্য হইয়াছে। দিল্লি সরকার মাত্র ১টি রূপায়িত করিতে পারিলেও পশ্চিমবঙ্গ তাহাও করিতে পারে নাই। উল্লেখ্য, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট নিজেরা অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসাইয়া নিজেদের চাহিদা পূরণ করিতেছে। হরিয়ানা উদ্বৃত্ত অক্সিজেন দিল্লিকে দিতেছে। অথচ 'বাংলার গর্ব' মমতা ব্যানার্জি কুম্ভীরাশ্রু মোচন করিয়া প্রধানমন্ত্রীকে গালিগালাজ করিতেছেন।

করোনা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী অতি সদিচ্ছার পরিচয় দিতেছেন। তিনি দেশের ৮০ কোটি মানুষকে দুই মাস বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করিবার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার আহ্বানে বড়ো বড়ো শিল্পপতিরা সহযোগিতার হাত বাড়াইয়া দিয়াছেন। আম্বানি ও টাটা গোষ্ঠী অক্সিজেন সরবরাহ করিবার দায়িত্ব লইয়াছে। আদানি গোষ্ঠী ভেন্টিলেশন সরবরাহ করিতেছে। স্বামী নারায়ণ মন্দির কর্তৃপক্ষ কোভিড সেন্টার করিয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে জার্মানি ও সিঙ্গাপুর হইতে ২৩টি অক্সিজেন প্ল্যান্ট আসিয়াছে। রেলদপ্তর বিভিন্ন স্টেশনে রেলের বগিকে কোভিড সেন্টার করিয়াছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ-সহ বিভিন্ন সমাজসেবী ও ধর্মীয় সংস্থা নানা সেবাকাজে নামিয়া পড়িয়াছে। করোনা মোকাবিলায় নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব সমগ্র বিশ্বে প্রশংসিত ও অভিনন্দিত হইতেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কোনো ব্যবস্থা না করিয়া করোনাকে নির্বাচনের ইস্যু করিয়াছেন। কাঠগড়ায় তুলিয়াছেন নির্বাচন কমিশনকেও। স্বভাবতই রাজ্যের মানুষ তাঁহার এই মিথ্যাচারিতাকে সহ্য করিতেছে না। করোনার মতো মহামারীকে লইয়া যাঁহারা রাজনীতি করিতেছেন, ইতিহাস তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিবে না। তাঁহাদের স্থান হইবে আস্তাকুড়ে।

সুভাষিতম্

অজাতমৃতমূর্খেভ্যো মৃতাজাতৌ সুতৌ বরম্।

যতস্তৌ স্বল্পদুঃখায় যাবজ্জীবং জড়ো দহেৎ।।

অজাত, মৃত ও মূর্খ— এই তিন প্রকারের পুত্রের মধ্যে অজাত ও মৃতপুত্র বরং ভালো। কেননা, এরা স্বল্প দুঃখের কারণ হয়। কিন্তু মূর্খপুত্র যাবজ্জীবন যন্ত্রণা দেয়।

মৃত্যুদিনে কারও মন্দ দিকটি তুলে ধরা হয় না

কল্যাণ গৌতম

রবীন্দ্র-পরিকর রানী চন্দ ‘আমার মা’র বাপের বাড়ি’ গ্রন্থ লেখবার আগে মহা উৎসাহে এ-গল্প সে-গল্প করতেন গুরুদেবের কাছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘গ্রামে ভালোর দিকটা যেমন আছে খারাপ দিকও আছে। খারাপ দিকটা বাদ দিয়ে যা সুন্দর— সেইটুকুই শুধু ছবির মতো ফুটিয়ে তুলবি।’ রানী তাই করলেন, সমালোচনা-বর্জিত সহজ-সরল ছবির মতো হয়ে রইলো সে কাহিনি; সুখপাঠ্য, শিশুপাঠ্য।

খড়দহের এক বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি ছোটোগল্প পড়েছিলাম। বিষয় ছিল— এক মৃতব্যক্তির স্মরণসভায় উপস্থিত হয়ে জনৈক ব্যক্তি মৃতব্যক্তির ক্লেদাক্ত জীবন নিয়ে তুলোধুনো করছেন, বিরূপ সমালোচনা করছেন এবং অবশেষে সভ্যবৃন্দের দ্বারা তীব্র ভর্ৎসিত হচ্ছেন। অথচ আলোচক ব্যক্তি একবিন্দুও তো মিথ্যে কথা বলেননি সেদিন, এককণাও অসত্য কথা ছিল না তার কণ্ঠে। কথার স্থান-কাল-পাত্র আছে। ‘শব্দ’-ই ব্রহ্ম; একবার প্রয়োগ করলে আর ফিরে আসে না।

রবীন্দ্রনাথের ‘শ্যামা’ নৃত্যনাট্যের গান মনে পড়ছে— প্রেমতীব্র কামনায়, উদ্বেলতায় শ্যামা পাপপুণ্যের বোধরহিত; তরুণ উত্তীয়ের প্রেমকে বলি দিয়ে বজ্রসেনকে মুক্ত করালেন, কারণ শ্যামার কাছে বজ্রসেনের শরীরী-সৌন্দর্যের আকর্ষণ উত্তীয়ের প্রেমের চাইতেও বড়ো। বজ্রসেন যখন এই সংবাদ শুনলেন, শ্যামাকে ক্ষমা করতে পারলেন না, শ্যামার অপরাধবোধ তাকে পীড়ন করল। এই বজ্রসেনকে পাবার জন্যই প্রেমিকা আজ অপর প্রেমপ্রার্থীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়ে হত্যা করিয়েছে। তাই শ্যামাকে পেয়েও ত্যাগ করলেন বজ্রসেন। তিনি জানেন এই ক্ষমাহীনতার ক্ষমা নেই— না নিজের কাছে, না ঈশ্বরের কাছে। ঈশ্বর-চরণে-বিনতা অভাগিনী শ্যামাকে ক্ষমা করবেন ঈশ্বর, কিন্তু বজ্রসেনকে করবেন না; গানের কলিতে সে কথাই ধরা আছে :

“...পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু
পাপেরে ডেকে এনেছি।
জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা।
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা,
পাপীজনশরণ প্রভু।।

শত অপরাধেও সেদিনের মতো ক্ষমা করার কথা, অন্তত মৃত্যুর পর, শোক মূর্চ্ছনায়। যিনি পরকালে যাত্রা করেছেন তাকে সেই মুহূর্তে তিরবিদ্ধ করা সহৃদয় পাঠক ও শ্রোতার কাছে চরম ক্ষমাহীনতার পরিচয়। যে আমার পাশে যেতে যেতে স্তব্ধ হয়ে গেল, নাইবা তাকে বিদ্ধ করলাম অন্ত্যেষ্টির দিন, ‘মরার উপর খাঁড়ার ঘা’ দিয়ে। স্মৃতির পটে ব্যথা থাকলেও সেদিন আর বিরোধিতা থাকে না। একে কি পাঠকবৃন্দ আমার ‘দীনতা’ মনে করবেন? তীব্র সমকালীন রাজনৈতিক বিরোধ থেকে যে ব্যক্তি চিরতরে সরে গেলেন— তার প্রতি তীব্র বিরোধ বজায় রেখে মৃত্যুর দিন, অন্ত্যেষ্টির দিন, স্মরণ সভার দিন বিদ্বেষ পোষণ করে লাভ কী? কারও রাজনৈতিক অনৈতিকতা রাজনীতি দিয়েই প্রতিহত করতে হবে, অসুরের মতো সাগরেদের পেশীশক্তি এবং অন্যায় বাহুবল মোকাবিলার জন্য রাজনৈতিক পথ বেছে নিতে হবে। তবে মানবিক সৌজন্যে সামান্য খামতি যেন না হয়।

একজন মৃত ব্যক্তির প্রতি কোন্ বাক্য কীভাবে প্রয়োগ করা উচিত, সে সম্পর্কে রাজনীতিবিদদের ‘সংস্কারিত শিক্ষা’ থাকা উচিত। যতক্ষণ সে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী, ততক্ষণ ;:সে রাজনৈতিক আক্রমণের যোগ্য, কিন্তু যখন মহাশক্তির মহতি সত্তা নিজেই তাকে আপনার পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন, সেখানে তীব্র আক্রোশ প্রকাশ কোনো রাজনীতিবিদের পক্ষে অনুদারতার লক্ষণ। আপনি ইহজাগতিক মানুষের সঙ্গে লড়তে পারেন। যিনি মহাকালে বিলীন হয়েছেন, দাহকর্মের দিন তার প্রতি অসূয়া-দান রাজনৈতিক সৌজন্যের বিরোধী। ▯

এক দফায় ভোট চাই
এক খামে দুই চিঠি

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,
হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা
দিদি,

এই চিঠি যখন লিখছি তখন ভোট শেষ। ফল ঘোষণার বাকি। জানি না, আপনি আর নবান্নে যেতে পারবেন কিনা তাই বাড়ির ঠিকানাতেই চিঠি পাঠালাম। এই ভোটে, সরি, আপনার কথা অনুযায়ী খেলায় অনেক খেলাই দেখলাম। তবে এবার খেলা মনে হয় কিছুটা কমই হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে যথেচ্ছ ছাপ্পা, ভোট লুঠ, বুথ জ্যাম এসব হয়নি। না, হয়েছে। অন্তত আপনার দল তৃণমূল সবচেয়ে বেশি অভিযোগ করেছে। বিরোধীরাই সাধারণত এই ধরনের অভিযোগ তুলে থাকে। কিন্তু এবার আপনি একাই বলে গিয়েছেন, ওই দেখুন কমিশন সাহেব, আমার দুষ্টু ছেলেদের কেউ খেলতে দিচ্ছে না। সবাই ফাউল করছে। সবাই অফ সাইডে গোল দিচ্ছে।

আসলে দিদি, এবারও লজ্জা লেগেছে। এই পর্বে একই সঙ্গে নির্বাচন হয়েছে অসম, তামিলনাড়ু, কেরল ও পণ্ডিচেরিতে। সেসব রাজ্যে ভোট এল-গেল কেউ টের পেল না। ওখানেও কিন্তু তৃণমূল ছাড়া সবাই লড়াই করেছে। তাহলে কি দিদি তৃণমূল বলেই গোলমাল? না এটা ঠিক নয়। দিদি, সব দোষ আপনার নয়। এটা বাম জমানার সংস্কৃতি। বামেরা কেরলে এক রকম কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আর এক রকম। আরও একটা কথা দিদি, বিজেপি কিন্তু সব জায়গায় আছে। বাকি জায়গায় কিন্তু বিজেপির বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ ওঠেনি। আরও একটা কথা। কেন্দ্রীয় বাহিনীও সব জায়গায় ছিল। কিন্তু আর কোথাও সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঘিরে ফেলার পরামর্শ দেয়নি।

বাঙ্গালির লজ্জা শুরু হয়েছিল ভোট ঘোষণার দিনই। মনে পড়ছে সেই ঘোষণা। ২৯৪ আসন বিশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গে ৮ দফায় ভোটগ্রহণ। এমনকী শুধুমাত্র দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তিনদিনে ভোট। যেখানে ২৩৪ আসনের তামিলনাড়ু, ১৪০ আসনের কেরল এবং ৩০ আসনের পুদুচেরিতে একদফায় ভোট। ১২৬ আসন বিশিষ্ট অসমে তিন দফায়। অন্যান্য রাজ্যে যেখানে একজন বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক, সেখানে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই দু'জনকে পাঠানো হয়।

একটা পুরনো কথা মন করাই দিদি। এক সময়ে বলা হতো, বিহারে সবচেয়ে বেশি গোলমাল হয়। এ দেশে প্রথম বুথ দখল বিহারেই। ভারতের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রথম নথিবদ্ধ বুধ দখলের ঘটনা ১৯৫৭ সালে, বিহারের বেগুসরাইয়ে। সেই বিহারও ইদানীংকালের সব ভোটেই নজির রেখেছে। লোকসভা নির্বাচন তো বটেই গত বিধানসভা ভোটেও বিহার গোলা, বারুদ, গুলি, রক্ত ছাড়াই ভোট দেখিয়ে দিয়েছে।

দিদি, আপনি যদি আবার ক্ষমতায় আসেন তবে প্লিজ আর খেলায় মন দেবেন না। সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ হলেও আব্দারটা জানিয়ে রাখলাম।

ঃ ঃঃঃ ঃ

মাননীয় দিলীপ ঘোষ
রাজ্য সভাপতি, বিজেপি
দাদা,

আপনাদের স্লোগান ছিল 'আসল পরিবর্তন। দুর্নীতি বন্ধ করা বা সকলকে সমান চোখে দেখা। রাজ্যের আসল উন্নয়ন এসব করুন বা না করুন একটা বিষয়ে খেয়াল রাখবেন রাজ্য যেন 'ভোট মানেই অশান্তি' এই পরম্পরা থেকে মুক্তি পেতে পারে।

দাদা, বিজেপি ক্ষমতায় এলে, যেটার সম্ভাবনা খুবই বেশি, আপনি মুখ্যমন্ত্রী হোন বা না হোন, শাসক দলের রাজ্য সভাপতির কাছে আগাম আব্দার রইল, বিজেপি শাসিত বাঙ্গলায় যেন ভোট এক দফায় করা যায়। নির্বাচন কমিশন যেন সাহস দেখাতে পারে। ▯

শিক্ষক সমাজের জন্য এক প্রয়োজনীয় গ্রন্থ

বিজয় আঢ্য

মানুষ যখন চলে তখন একটা পায়ে ভর দিয়ে আরেকটা পা সামনের দিকে ফেলে। পেছনের পায়ে ভর না দিয়ে সামনের পা ফেলা যায় না। পেছনের পা অর্থাৎ অতীতকে ভর দিয়েই বর্তমান ও ভবিষ্যতের পথে চলতে হয়। এ কারণেই অতীত বা ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বিকাশের জন্য তাই শিকড়ের সন্ধান। শিক্ষা ক্ষেত্র তার ব্যতিক্রম নয়। 'ভারতবর্ষের চার হাজার বছরের শিক্ষার ইতিহাস'-এর লেখক শ্রী অমলেশ মিশ্র মহাশয় সেই কাজটি করারই প্রয়াস করেছেন। তবে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, 'এই গ্রন্থটি- একটি সংকলন মাত্র'। তবুও বলতে হয়, দুই মলাটের মধ্যে ভারতবর্ষের শিক্ষার চার হাজার বছরের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস তুলে ধরার এই প্রয়াস শিক্ষাচর্চা বা গবেষণার ক্ষেত্রে একটা অন্য মাত্রা দিয়েছে।

শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলনের এক নেপথ্য নায়ক ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অন্যতম সর্বভারতীয় অধিকারী মোরপন্ত পিংলেজী আমাদের একটি মানচিত্র দেখিয়েছিলেন— দ্য হিস্টোম্যাপ। মেক্সিকো থেকে প্রকাশিত মানচিত্রটি অনেকটা আমাদের জন্মকুণ্ডলীর মতো লম্বা— সচরাচর মানচিত্রের মতো আয়তক্ষেত্রের নয়। ওই মানচিত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদয়, অগ্রগতি ও বিলয়ের কালখণ্ডগুলি রেখা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। সেখানে ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ যার প্রাচীনত্ব ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা আজও বর্তমান। বস্তুত বিশ্বে এমন কোনও দেশ নেই যার চার হাজার বছরের ইতিহাস পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে শিক্ষার সুস্পষ্ট ধারণা হলো মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। তা শুধু জীবিকা অর্জনের একটা হাতিয়ার নয়। তাই ভারতীয় শিক্ষায় পরাবিদ্যা (সৃষ্টিকর্তার বিষয়ে জ্ঞান) ও অপরা বিদ্যা (মূলত মূল্যবোধভিত্তিক জীবিকার্জনের প্রসঙ্গ) বিষয়ে ভাবা হয়েছে যা বিশ্বের অন্য কোনও দেশে দেখা যায় না। এই শিক্ষা একজন্মে নাও হতে পারে। উল্লেখ্য,

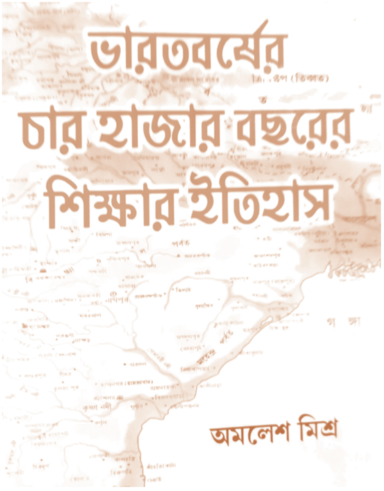

ভারতীয়রা পুর্নজন্মে বিশ্বাসী। ভারতের শিক্ষা বিষয়টি বিদেশ থেকে আসেনি। সম্পূর্ণ নিজস্ব। প্রায় তিন হাজার বছর ধরে (খ্রি.পূর্ব ২০০০ বছর এবং তার পরের ১০০০ বছর) ভারতে এই শিক্ষা ভাবনা প্রচলিত ছিল। এই শিক্ষা ভাবনা ভারতবর্ষের কী উপকার করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে বিভিন্ন শতাব্দীতে বিদেশ থেকে যে বিদ্বজ্জনেরা এসেছিলেন তাঁদের লেখায়। মেগাস্থিনিস (খ্রি.পূর্ব চতুর্থ শতাব্দী), হিউ-এন-সাঙ্ (৭ম শতাব্দী), চীন সম্রাট ইয়াং চি (৬৫০ খ্রি.), মার্কোপোলো (ত্রয়োদশ শতাব্দী), অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার (উনবিংশ শতাব্দী), সাম্প্রতিকালের আমেরিকার বিখ্যাত ঐতিহাসিক উইল ডুরান্ড প্রমুখ সকলেই স্বীকার করেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যে কোনও দেশের তুলনায় ভারতীয়দের গুণমান অনেক উন্নত ছিল এবং তা অবশ্যই ভারতবর্ষের তদানীন্তন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার কারণেই।

এরপর অষ্টম থেকে দশম শতাব্দী (৭৪০-১০০০ খ্রি.) পর্যন্ত ২৬০ বছরের এই কালখণ্ডটিতে প্রাচীন ভারতের যুগ শেষ ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের সূচনা হলো। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থের লেখক বলেছেন, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'দি হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অব দি ইন্ডিয়ান পিপল' গ্রন্থটির অনুসরণে তিনি ভারতের চার হাজার বছরের ইতিহাসের যুগবিভাগগুলি করেছেন। যেমন, ১০০০ থেকে ১২০০ খ্রি.—এই দুশো বছরে দু'বার ভারতের উপর ইসলাম আক্রমণ হয়েছিল। প্রথমে সুলতান মামুদ ও তারপর মহম্মদ ঘোরি। পরিণতিতে ভারতবর্ষে বিদেশি ইসলামিদের শাসন শুরু হয়। লক্ষণীয় হলো, শিক্ষা বিষয়ে হিন্দু চিন্তা ও ধারণা মুসলমান বা ইসলামিদের শিক্ষা চিন্তা ও ধারণার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত তখনও ছিল এবং এখনও আছে। মুসলমানদের বিশ্বাস— যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় কোরান শরিফেই আছে। তাই অন্যকিছু জানার আর প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে হিন্দুরা শিক্ষাকে কখনই এত সংকীর্ণ অর্থে ভাবেনি, গ্রহণ করা তো দূরস্থান। ফলে ভারতবর্ষে হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থা ও মুসলমান শিক্ষাব্যবস্থা— দুটি পৃথক ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। মুসলমানদের শিক্ষার বিষয়, পদ্ধতি, প্রণালী ও শিক্ষালয় (মসজিদ কেন্দ্রিক) এদেশে এতকাল প্রচলিত ব্যবস্থার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো যে বিদেশি আক্রমণকারীদের বর্বরতা, অত্যাচার, ধ্বংসলীলা ইত্যাদির মধ্যেও ভারতীয়দের মনে শিক্ষার প্রতি নিষ্ঠা ও ভালোবাসা এ যুগে আদৌ কমেনি। বস্তুত এই সময়কাল অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীর অন্য কোনও দেশই, কোনও বিষয়েই ভারতের থেকে উন্নত ছিল না এবং ভারতীয় সংস্কৃতি মধ্য এশিয়া, পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়ার বহু দেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল।

শিক্ষার ইতিহাস লিখতে গিয়ে এদেশবাসী ভারতীয় ও বিদেশাগত

মুসলমানদের বিষয়ে লেখক বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, সুলতান মামুদের কাল অর্থাৎ ১০০০ খ্রি. থেকে ঔরঙ্গজেবের আমল ১৭০৭ পর্যন্ত অর্থাৎ ৭০০ বছরের ইতিহাস তিনি খুঁজে পাননি। তার কারণ হলো বিদেশি আক্রমণকারী ইসলামিরা যা তাদের ধর্মমতের অনুসারী ছিল না তা তারা নির্বিচারে ধ্বংস করেছিল এবং এই ধ্বংসলীলায় ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা বাদ যায়নি।

মোগল শাসনের অবসান (১৭৬৫ খ্রি.) এবং মারাঠাশক্তির উত্থান-পতন (১৮১৮) মোটামুটি এই পঞ্চাশ বছর ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই সময় থেকে ভারতবর্ষ মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে প্রবেশ করল। ভারতীয়রা ইংরেজি ভাষা শিখতে শুরু করল যা পরবর্তীকালের ভারতীয়দের জীবন ও চিন্তায়, ধর্মীয়, সামাজিক ও শিক্ষা ব্যবস্থায় যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। ভারতের আধুনিক শিক্ষা বা ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাসে মেকলে সাহেবের 'মিনিট' (২.০২.১৮৩৫ খ্রি. তাঁর বাবাকে লেখা চিঠি) একটা মাইল ফলক বলা যায়। তিনি চেয়েছিলেন, ভারতের মধ্যে একটা ছোট্ট গোষ্ঠী তৈরি করতে যারা রূপে রঙে হবে ভারতীয় কিন্তু চালচলন, চিন্তাভাবনা ও সংস্কৃতিতে হবে খাঁটি ইংরেজ অর্থাৎ 'ব্রাউন ইংলিশম্যান'। আজ যে সংকটময় কালখণ্ডের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি তার জন্মদাতার মর্যাদা বাঙ্গলার এই বুদ্ধিজীবীদেরই প্রাপ্য। খোদ কলকাতাতে বসেই মেকলে সাহেব তাঁর মিনিট লিখেছিলেন। এই বাঙ্গলার বুকেই ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা। (যা পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সি কলেজ বা আরও পরে বিশ্ববিদ্যালয়) ওই কলেজের অধ্যাপক ডিরোজিও-র নেতৃত্বে একশ্রেণীর ছাত্র যারা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত, তারা যা কিছু ভারতীয় তা অস্বীকার করতে থাকে। তবে ব্রিটিশ শিক্ষাতন্ত্র থেকে দেশকে বাঁচিয়ে তোলার প্রয়াসও পাশাপাশি শুরু হয়েছিল। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটি, রাজনারায়ণ বসুর স্বদেশী মেলার মাধ্যমে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের প্রথা পুনরায় চালুর চেষ্টা, লোকমান্য তিলকের রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের প্রচলন, শ্রীঅরবিন্দের কলকাতায় ন্যাশনাল কলেজে অধ্যক্ষের পদে যোগদান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনের মাধ্যমে আশ্রমিক প্রথায় শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োগ, মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদি বিদ্যালয় স্থাপনের আগ্রহ, দয়ানন্দ সরস্বতীর অ্যাংলো বৈদিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে চেষ্টা করা হয়েছিল।

স্বাধীন ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য অনেকগুলি কমিটি যেমন, রাধাকৃষ্ণান কমিশন, মুদালিয়র কমিশন, কোঠারী কমিশন বসেছে। কিন্তু সেই কমিশনগুলি কিছু সংস্কার করার কথা বলেছে মাত্র, মৌলিক বিষয়ে স্পর্শও করেনি। তবে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর (১৯৮৪) ও নরসিমা রাওয়ের সময় থেকেই ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী যথেষ্ট দায়িত্বশীল হতে শুরু করেছিল। প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ন্যাশনাল পলিসি অব এডুকেশন (এনপিই) তৈরি করে শিক্ষাক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনলেন। আর তাঁর উত্তরসূরি নরেন্দ্র মোদীর ২০২০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষায় শিক্ষানীতির উত্তরাধিকার ও শিক্ষার দেশবিরোধী বামপন্থীকরণের প্রভাব থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করার চেষ্টা এই শিক্ষা নীতিতে করা হয়েছে। জোর করে চাপিয়ে দেওয়া চিন্তাধারার গলাধঃকরণের বদলে স্বাধীনচিন্তার বিকাশ ঘটানো ও ছাত্রের বিষয় বাছাইয়ে স্বাধীনতা, সেইসঙ্গে পড়াশোনার মধ্যে নির্দিষ্ট ছেদের সুযোগ প্রভৃতি আমাদের নতুন শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন।

বস্তুত ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগের শিক্ষার ইতিহাস বিভিন্ন গ্রন্থে কম-বেশি আলোচিত হলেও তা এমনভাবে দুই মলাটের মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এর আগে কখনও হয়নি। শুধু তাই নয়, প্রতিটি যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে তৎকালীন শিক্ষার পরিস্থিতি এবং সেই শিক্ষাব্যবস্থার ফলাফল আলোচনা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি, যেমন, লিপি ও লিখন পদ্ধতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্রভর্তি, পাঠ্যপুস্তকাদি, শিক্ষা প্রণামী, গুরু বা ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, স্নাতকদের সমাবর্তন, বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা, আশ্রমিক বিদ্যালয় বা বিহার, অর্থব্যবস্থা, শিক্ষা ক্ষেত্রে আইন, শিল্প ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা, শিক্ষায় নারী ও অন্যান্যদের জন্য শিক্ষা প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে। এদিক থেকে গ্রন্থটি শিক্ষক ও শিক্ষা জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিশেষ প্রয়োজন সাধন করবে। গ্রন্থটি আরও ঋদ্ধ রয়েছে ঋণস্বীকার হিসেবে গ্রন্থপঞ্জীর ও নির্ঘণ্টের কারণে। তাই গ্রন্থটি বিদ্বজ্জন সমাজে সমাদৃত হবে বলে মনে করি এবং সেই সঙ্গে এমন একটি গ্রন্থ রচনার জন্য গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে এটির যথাযোগ্য প্রচার হবে বলে আশা করি।

পুস্তক : ভারতবর্ষের চার হাজার বছরের শিক্ষার ইতিহাস (২০২০ সাল পর্যন্ত)।
লেখক : অমলেশ মিশ্র।
মূল্য : ৮০০/- টাকা।
তুহিনা প্রকাশনী,
৩০/৬/২এ, মদন মিত্র লেন,
কলকাতা-৭০০০০৬।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সোনারপুর শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী গত ৯ এপ্রিল পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। তিনি দুই পুত্র ও এক কন্যা রেখে গিয়েছেন। তাঁর দুই পুত্রই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। তিনি কয়েক বছর সঙ্ঘের প্রচারকও ছিলেন। বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি নিজের বাড়িতে রামশিলা পূজা করে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাটোয়া জেলার এড়েরা গ্রামের স্বয়ংসেবক ও অখণ্ড বর্ধমান জেলার জেলা শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখ সতীনাথ পালিত গত ২১ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ কন্যা ও ১ পুত্র রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, ১৯৭৯ সালে তিনিই তাঁর গ্রামে শাখা শুরু করেন। তাঁরই প্রেরণায় কেতুগ্রাম খণ্ডের গ্রামে গ্রামে শাখা শুরু হয়। সদাহাস্যময় সতীনাথদা এলাকার স্বয়ংসেবকদের প্রেরণাপুরুষ ছিলেন।

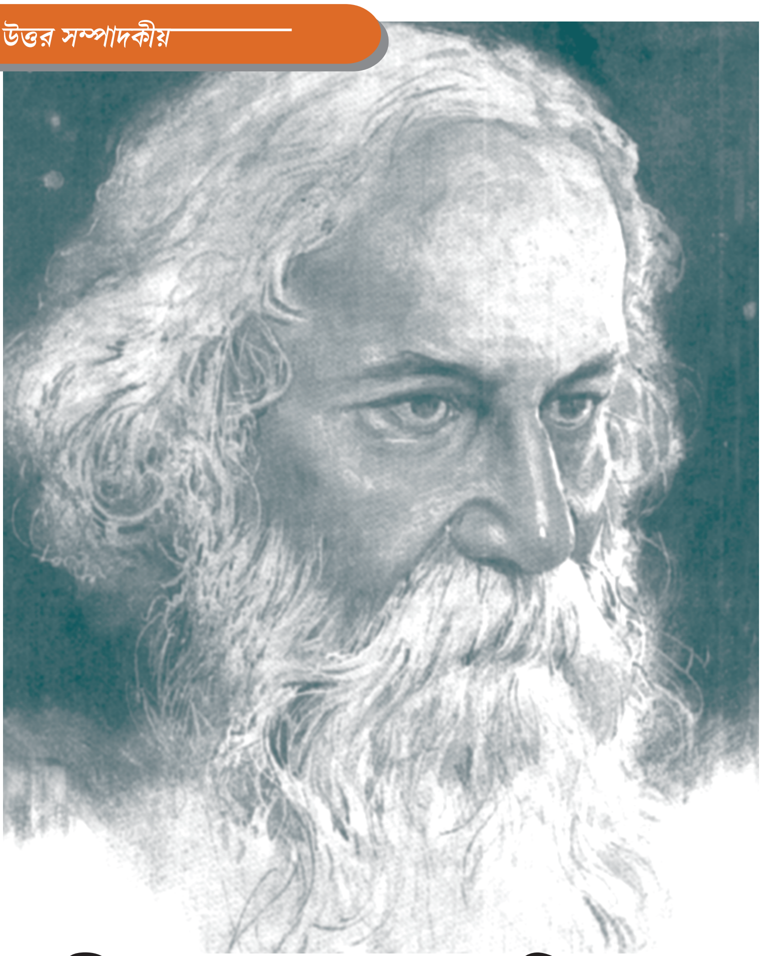

রবীন্দ্র-অনুধ্যানে হিন্দুত্ব ও হিন্দুসভ্যতা

অমিত দাশ

মহাপ্রয়াণের মাত্র একবছর পূর্বে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থভুক্ত একটি কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিটি ছিল—

'মোরে হিন্দুস্থান
বার বার করেছে আহ্বান
কোন শিশুকাল হতে পশ্চিমদিগন্ত-পানে,
....................'

তাৎপর্যপূর্ণভাবে কবিতার নাম 'হিন্দুস্থান'। রবীন্দ্ররচনার তন্নিষ্ঠ পাঠক জানেন 'হিন্দুস্থান' তাঁর রচনায় অতি প্রচলিত একটি শব্দ নয়— এর আদৌ কোনো নজির আছে কিনা স্মরণ করা দুরূহ।

রবীন্দ্রনাথের লিখন-পদ্ধতির তত্ত্বতালাশ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল পাঠক জানেন রচনায় একটিমাত্র শব্দ ব্যবহারেও রবীন্দ্রনাথ কতটা সতর্ক থেকেছেন। একটি নয়, দুটি নয় কমপক্ষে দশটি পাণ্ডুলিপিতে সংযোজন-বিয়োজনের পর 'রক্তকরবী' নাটকের সর্বশেষ পাঠটি গ্রহণ করেছিলেন লেখক। 'জীবনস্মৃতি'র রয়েছে অন্তত তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পাঠ।

স্বভাবতই শব্দচয়নে কিংবা রচনার পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করবার বিষয়ে অতি-সাবধানী রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুস্থান' শব্দটি গ্রহণ করবার সময় মনে মনে ঠিক কী ভেবেছিলেন তা অনুমান করবার জন্য কল্পনাকে লাগামছাড়া করা যেতে পারে নিশ্চিতভাবেই, কিন্তু একান্তই নিরবলম্ব অভিযোগ বাতিল করা যাবে না, এমন একটি ধারণা পেতে আমরা রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধের দ্বারস্থ হতে পারি, যেখানে প্রবন্ধকার বলেছেন— "মামুদের আক্রমণ হইতে লর্ড কার্জনের সাম্রাজ্যগর্বোদ্‌গারকাল পর্যন্ত যে কিছু ইতিহাসকথা তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা; তাহা স্বদেশ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র। তাহা এমন স্থানে কৃত্রিম আলোক ফেলে, যাহাতে আমাদের দেশের দিকটাই আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়া যায়। সেই অন্ধকারের মধ্যে নবাবের বিলাসশালার দীপালোকে নর্তকীর মণিভূষণ জ্বলিয়া উঠে, বাদশাহের সুরাপাত্রের রক্তিম ফেনোচ্ছ্বাস উন্মত্ততার জাগররক্ত দীপ্তনেত্রের ন্যায় দেখা দেয়; সেই অন্ধকারে আমাদের প্রাচীন দেবমন্দিরসকল মস্তক আবৃত করে এবং সুলতান-প্রেয়সীদের শ্বেতমর্মর রচিত কারুখচিত কবরচূড়া নক্ষত্রলোক চুম্বন করিতে উদ্যত হয়। সেই অন্ধকারের মধ্যে অশ্বের ক্ষুরধ্বনি, হস্তির বৃংহিত, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, সুদূরব্যাপী শিবিরের তরঙ্গিত পাণ্ডুরতা, কিংখাব-অস্তরণের স্বর্ণচ্ছটা, মসজিদের ফেনবুদ্‌বুদাকার পাষাণমণ্ডপ, খোজাপ্রহরীরক্ষিত প্রাসাদ-অন্তঃপুরে রহস্যনিকেতনের নিস্তব্ধ মৌন— এ সমস্তই বিচিত্র শব্দে ও বর্ণে ও ভাবে যে প্রকাণ্ড ইন্দ্রজাল রচনা করে তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া লাভ কী? তাহা ভারতবর্ষের পুণ্যমন্ত্রের পুঁথিটিকে একটি অপরূপ আরব্য উপন্যাস দিয়া মুড়িয়া রাখিয়াছে— সেই পুঁথিখানি কেহ খোলে না, সেই আরব্য উপন্যাসেরই প্রত্যেক ছত্র ছেলেরা মুখস্থ করিয়া লয়।"

রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দুস্থান' কবিতায় 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' নামের মোড়কে যে কুহেলিকা আচ্ছন্ন হয়ে আছে তার থেকে বহু দূরে অবস্থিত প্রাচীন হিন্দুস্থানের দিকে মুখ ফেরাবার কথা বলবেন?

স্বামী বিবেকানন্দ যখন বলেন— 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ', তখন তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন জীবনের প্রায় অন্তিম লগ্নে 'হিন্দুস্থান'-এর আহ্বান শোনেন, তখন তা নিশ্চিতভাবেই বহু আলোচনার দ্বার উন্মোচন করে দেয়।

'হিন্দুস্থান'-এর আহ্বান রবীন্দ্রনাথ শুনেছেন জীবনের সূচনাকালে, যখন রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র পরিকল্পিত হিন্দুমেলায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। এই পর্বে তাঁর রচিত গানসমূহ— 'ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি', 'একি অন্ধকার ভারতভূমি', 'তোমারি তরে, মা, সঁপিনু এ দেহ'— প্রায়

সবগুলিই গীত হয়েছে হিন্দুমেলায়। প্রথমোক্ত গানটির প্রথম পঙ্‌ক্তিটি উদ্ধারযোগ্য, যেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

‘ভারত রে, তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি
যতদিন সিন্ধু না ফেলিবে গ্রাসি ততদিন তুই কাঁদ রে।
এই হিমগিরি স্পর্শিয়া আকাশ প্রাচীন হিন্দুর কীর্তি-ইতিহাস
যতদিন তোর শিয়রে দাঁড়ায়ে অশ্রুজলে
তোর বক্ষ ভাসাইবে
ততদিন তুই কাঁদ রে।’

মাত্র সতেরো বছর বয়সে গানটি রচনার পর রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবন নানা ঘাত-প্রতিঘাত, ওঠা-পড়া, সাফল্য ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। পিতা দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে হিন্দুধর্মে আস্থাশীল অসংখ্য মানুষের প্রাত্যহিক ধর্মাচরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ মূর্তিপূজায় অনাস্থা প্রকাশ করে এমনকী বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গেও মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখের উদ্যোগে পরে বঙ্কিমচন্দ্রকে জোড়াসাঁকো বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে মিটিয়ে নেওয়া হয়েছে মতভেদ।

চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে হিন্দুধর্মের নানা অনুষঙ্গ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতপার্থক্যের ইতিহাস সর্বজনবিদিত, যদিও দু’জনের ব্যক্তিগত সম্পর্কে তা কোনো আঁচ লাগতে দেয়নি।

এখানে অবশ্য উল্লেখ্য যে, ঋগ্‌বেদ-ধৃত ‘একং সদ্ বিপ্র বহুধা বদন্তি’ এবং উপনিষদের মহান মন্ত্রসমূহকে আশ্রয় করে বিকশিত ব্রাহ্মধর্মে আস্থা প্রকাশ করলেও রবীন্দ্রনাথ কখনোই নিজেকে বৃহত্তর হিন্দুসমাজের বাইরের বলে মনে করেননি। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে তৃতীয় জনগণনার সময় ত্রিধাবিভক্ত ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র সেন পরিচালিত নববিধান গোষ্ঠী ও শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের নেতৃত্বাধীন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নিজেদের স্বতন্ত্র ধর্মসম্প্রদায় বলে ঘোষণা করলেও রবীন্দ্রনাথ পরিচালিত আদি ব্রাহ্মসমাজ নিজেদের তেমনটা মনে করেননি।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ওই বছরের ফাল্গুন সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত পরিবারগুলিকে ‘হিন্দু ব্রাহ্ম’ রূপে নিজেদের শ্রেণীবদ্ধ করবার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিসেবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলার জনগণনাকার্যের ভারপ্রাপ্ত পদাধিকারী C.J. O'Donnell-কে জানুয়ারি ১৮৯১-এর ৯ তারিখে লিখিত পত্রে তাঁদের ‘Theistic Hindus’ আখ্যায় অভিহিত করবার অনুরোধ জানিয়েছেন।

অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় বলেছেন রবীন্দ্রনাথ— ‘হিন্দুসমাজের দশজন যদি আমাকে হিন্দু না বলে এবং সেই সঙ্গে আমিও যদি আমাকে হিন্দু না বলি তবে সে বলামাত্রের দ্বারা তাহা কখনোই সত্য হইবে না।’

হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতার প্রতি নিজেদের ঋণের কথা স্বীকার করে তাঁর মনে হয়েছে— ‘আমরা যে ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছি তাহা বিশ্বজনীন, তথাপি তাহা হিন্দুরই ধর্ম। এই বিশ্ববোধকে আমরা হিন্দুর চিত্ত দিয়াই চিন্তা করিয়াছি, হিন্দুর চিত্ত দিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। শুধু ব্রহ্মের নামের মধ্যে নহে, ব্রহ্মের ধারণার মধ্যে নহে, আমাদের ব্রহ্মের উপাসনার মধ্যেও একটি গভীর বিশেষত্ব আছেই--- এই বিশেষত্বের মধ্যে বহুশত বৎসরের হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর ভক্তিতত্ত্ব, হিন্দুর যোগসাধনা, হিন্দুর অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, হিন্দুর ধ্যানদৃষ্টির বিশেষত্ব ওতপ্রোতভাবে মিলিত হইয়া আছে।’

বৃহত্তর হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন ব্রাহ্মসমাজের একটি অংশ খ্রিস্টানি ভাবধারায় আচ্ছন্ন হয়ে খ্রিস্টধর্মের কাছে নিজেদের ঋণের অন্ত নেই বলে প্রচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া ছিল যারপরনাই তীব্র। কিছু শ্লেষের সুরেই তাঁর মন্তব্য— ‘‘আমি জানি কোনো কোনো ব্রাহ্ম এমন বলিয়া থাকেন, আমি হিন্দুর কাছে যাহারা পাইয়াছি, খ্রিস্টানের কাছে তাহার চেয়ে কম পাই নাই— এমনকী, হয়তো তাহারা মনে করেন তাহার চেয়ে বেশি পাইয়াছেন। ইহার একমাত্র কারণ, বাহির হইতে যাহা পাই তাহাকেই আমরা পাওয়া বলিয়া জানিতে পারি— কেননা, তাহাকে চেষ্টা করিয়া পাইতে হয় এবং তাহার প্রত্যেক অংশকে অনুভব করিয়া পাই। এই জন্য বেতনের চেয়ে মানুষ সামান্য উপরি পাওনায় বেশি খুশি হইয়া উঠে। আমরা হিন্দু বলিয়া যাহা পাইয়াছি তাহা আমাদের রক্তে মাংসে অস্থিমজ্জায়, তাহা আমাদের মানস প্রকৃতির তন্তুতে তন্তুতে জড়িত হইয়া আছে বলিয়াই তাহাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পাই না, তাহাকে লাভ বলিয়া মনেই করি না— এই জন্য ইংরেজি পাঠশালায় পড়া মুখস্ত করিয়া যাহা অগভীরভাবে অল্প পরিমাণে ও ক্ষণস্থায়ী রূপেও পাই তাহাকেও আমরা বেশি না মনে করিয়া থাকিতে পারি না। মাথার ভারকে আমরা ভারী বলিয়া জানি না, কিন্তু মাথার উপরকার পাগড়িটাকে একটা কিছু বলিয়া স্পষ্ট বোঝা যায়। তাই বলিয়া একথা বলা সাজে না যে, মাথা বলিয়া জিনিসটা নাই পাগড়িটা আছে; সে পাগড়ি বহুমূল্য রত্নমাণিক্য জড়িত হইলেও এমন কথা বলা সাজে না।’’

হিন্দু ভারত, হিন্দু সভ্যতার প্রতি পরম শ্রদ্ধার মনোভাব থেকেই প্রাচীন ভারতে তপোবনের শিক্ষাধারার আদর্শে শান্তিনিকেতনে স্থাপন করেছেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়। কালের স্বাভাবিক নিয়মে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বপ্নের বিদ্যালয়কে যুগপ্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হননি। এর জন্য বেদনা ব্যক্ত করেছেন তিনি সারাজীবন— বার বার।

অপরপক্ষে যে মূর্তিপূজাকে উপলক্ষ্য করে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে মসীযুদ্ধ চালাবার সময় লেখনীকে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর করেছেন, হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী বিরাটসংখ্যক মানুষের ধর্মজীবনের অন্যতম সেই অনুষঙ্গ বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের বিস্ময়কর পরিবর্তন ধরা পড়েছে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীকে লিখিত এক পত্রে। কিছু পরিমাণে দীর্ঘ পত্রটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বহুল প্রচারিত নয়। পত্রে তিনি লিখেছেন— ‘কাল দুর্গাপূজা আরম্ভ হবে, আজ তার সুন্দর সূচনা হয়েছে। ...পরশু দিন সকালে সুরেশ সমাজপতির বাড়ি যাবার সময় দেখছিলুম রাস্তার দু’ ধারে প্রায় বড়ো বড়ো বাড়ির দালান মাত্রেই দুর্গার দশ-হাত তোলা প্রতিমা তৈরি হচ্ছে— এবং আশে পাশে সমস্ত বাড়ির ছেলের দল ভারী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দেখে আমার মনে হলো দেশের ছেলেবুড়ো সকলেই হঠাৎ দিনকতকের মতো ছেলেমানুষ হয়ে উঠে সবাই মিলে একটা বড়ো গোছের পুতুল খেলায় প্রবৃত্ত হয়েছে। ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে সমস্ত উচ্চাঙ্গের আনন্দমাত্রই পুতুল খেলা, অর্থাৎ তাতে কোনো উদ্দেশ্য নেই, লাভ নেই— বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বৃথা সময় নষ্ট। কিন্তু, সমস্ত দেশের লোকের মনে যাতে করে একটা ভাবের আন্দোলন, একটা বৃহৎ উচ্ছ্বাস এনে দেয়, সে জিনিসটি কখনোই নিস্ফল এবং সামান্য নয়।

উৎসবের সময় ভাবস্রোত দেশের

ফঃ ২

অধিকাংশ লোকের মন অধিকার করে নেয়। তখন, যেটাকে আমরা দূর থেকে শুষ্ক হৃদয়ে সামান্য পুতুলমাত্র দেখছি সেইটে কল্পনায় মণ্ডিত হয়ে পুতুল আকার ত্যাগ করে; তখন তার মধ্যে এমন একটি বৃহৎ ভাবের এবং প্রাণের সঞ্চার হয় যে, দেশের রসিক-অরসিক সকল লোকই তার সেই অমৃতধারায় অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। তার পরে আবার পুতুল যখন পুতুল হয়ে আসে তখন সেটাকে জলে ফেলে দেয়। পৃথিবীর সকল জিনিসই এই পুতুল। আমরা যাকে ভালোবাসি, অন্য লোকের কাছে সে একটি দৃশ্যমান আকার বিশিষ্ট মানুষ মাত্র। কিন্তু আমার কাছে সে একটি অপরূপ ভাবের জ্যোতিতে দীপ্যমান, আমার কাছে সে অসীম অনন্ত। যার কান নেই তার কাছে গান শব্দমাত্র, আমার কাছে সেই শব্দ সংগীত। অতএব একরকম করে দেখতে গেলে সব জিনিসই পুতুল, কিন্তু হৃদয়ের ভিতর দিয়ে, কল্পনার ভিতর দিয়ে দেখতে গেলে তাদের দেবতা বলে চেনা যায়, তাদের সীমা পাওয়া যায় না। এই কারণে, সমস্ত বাঙ্গলাদেশের লোক যাকে উপলক্ষ্য করে আনন্দে ভক্তিতে প্লাবিত হয়ে উঠেছে, তাকে মাটির পুতুল বলে যদি দেখি তবে তাতে কেবল আমারই ভাবের অভাব প্রকাশ পায়।'

স্বভাবতই নিরাকার সাধনা এবং মূর্তিপূজা দুই-ই রবীন্দ্রনাথের কাছে ঈশ্বরসাধনার পথ বলে প্রতিভাত হয়েছে। সহাবস্থানের এই রীতিই হিন্দুসভ্যতার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে তাঁর অনুভব— 'হিন্দুসভ্যতা যে এক অত্যাশ্চর্য প্রকাণ্ড সমাজ বাঁধিয়াছে তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই এমন জাত নাই। প্রাচীন শকজাতীয় জাঠ ও রাজপুত; মিশ্রজাতীয় নেপালি, অসমীয়, রাজবংশী, দ্রাবিড়ী, তৈলঙ্গী, নায়ার— সকলে আপন ভাষা, বর্ণ, ধর্ম ও আচারের নানা প্রভেদ সত্ত্বেও সুবিশাল হিন্দু সমাজের মধ্যে একটি বৃহৎ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একত্রে বাস করিতেছে। হিন্দু সভ্যতা এত বিচিত্র লোককে আশ্রয় দিতে গিয়া নিজেকে নানা প্রকারে বঞ্চিত করিয়াছে, কিন্তু তবু কাহাকেও পরিত্যাগ করে নাই— উচ্চ-নীচ, সবর্ণ-অসবর্ণ সকলকেই ঘনিষ্ঠ করিয়া বাঁধিয়াছে, সকলকে ধর্মের আশ্রয় দিয়াছে, সকলকে কর্তব্যপথে সংযত করিয়া শৈথিল্য ও অধঃপতন হইতে টানিয়া রাখিয়াছে।'

যে ভাবে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠান বা প্রবক্তাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক ধর্ম বিকশিত হয়েছে, হিন্দু ধর্মের সীমা সেভাবে গণ্ডিবদ্ধ বলে মনে করতেন না রবীন্দ্রনাথ। তাঁর বিশ্বাস ছিল— 'হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয় বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম কিন্তু হিন্দু কোনো একটি বিশেষ ধর্ম নয়। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম। ইহা মানুষের শরীর মন হৃদয়ের নানা বিচিত্র ব্যাপারকে বহু সুদূর শতাব্দী হইতে এক আকাশ, এক আলোক, এক ভৌগোলিক নদনদী অরণ্য পর্বতের মধ্যে দিয়া, অন্তর ও বাহিরের বহুবিধ ঘাতপ্রতিঘাত পরম্পরায় একই ইতিহাসের ধারা দিয়া আজ আমাদের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে।'

হিন্দু-বিশ্বাসের প্রত্যেকটি অনুষঙ্গ অনুবর্তন করে এর মাঝে বৃহত্তর-মহত্তের আহ্বানটি চিহ্নিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বহু বিতর্কিত, বহু আলোচিত হিন্দুর 'গো-ভক্তি' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অনুভব মহৎ এক অবলোকনে উন্নীত হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন— 'সকলেই জানে, গাভীকে ভারতবর্ষ পুজ্য করিয়াছে। গাভী যে পশু তাহা সে জানে না ইহা নহে। মানুষ প্রবল এবং গাভীই দুর্বল। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সমাজ গাভীর নিকট হইতে নানাপ্রকার মঙ্গললাভ করে। সেই মঙ্গল মানুষ যে নিজের গায়ের জোরে পশুর কাছ হইতে আদায় করিয়া লইতেছে এই ঔদ্ধত্য ভারতবর্ষের নহে। সমস্ত মঙ্গলের মূলে সে দৈব অনুগ্রহকে প্রমাণ করিয়া সকলের সঙ্গে আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে তবে বাঁচে।'

হিন্দুর 'গো-মাতা' ভাবনার প্রতি যে যুক্তি প্রদান করলেন রবীন্দ্রনাথ, তা এককথায় অনবদ্য।

ভারতবর্ষের মানুষ, আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে গেলে হিন্দু-ভাবধারার আদর্শে গড়ে ওঠা মানুষ নদী, অরণ্য, পর্বত, বৃক্ষ ইত্যাদি যাবতীয় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে সর্বশক্তিমানের আশীর্বাদ অনুসন্ধান করেছেন; যা অনেক সময়ই ব্যঙ্গবিদ্রূপের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে, যদিও একবিংশ শতাব্দীতে এসে মানুষ ক্রমশ হিন্দুর মনোভাবের সারবত্তা উপলব্ধি করতে পারছেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বহুপূর্বেই হিন্দু-বিশ্বাসের অসামান্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন— 'যে কোনো সম্বন্ধের মধ্য হইতে আমরা মঙ্গল লাভ করি সেই সম্বন্ধের মধ্য হইতে আমরা আদি মঙ্গলশক্তিকে স্বীকার করিতে চাই। সেই-সকল উপলক্ষ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মঙ্গল শক্তিকে সুদূর স্বর্গে স্থাপনপূর্বক পূজা করা ভারতবর্ষের ধর্ম নয়।'

ভারতবর্ষের জাতীয় চরিত্র যে হিন্দুত্বের ধারণাতেই সম্পূর্ণতা লাভ করে, জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তেমনটাই মনে করে এসেছেন। সেই কারণে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, কূপমণ্ডুকতার নিগর থেকে বের হয়ে হিন্দুসমাজ অতীত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হবে এমন প্রত্যাশা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— 'হিন্দুত্বের ধারণাকে তো আমরা নষ্ট করতে চাই না। হিন্দুত্বের ধারণাকে আমরা বড়ো করিয়া তুলিতে চাই।'

হিন্দুর অনৈক্য, নির্লিপ্ততা, জনসংখ্যা হ্রাস, সচেতনতার অভাব রবীন্দ্রনাথকে শঙ্কিত করেছে, হতাশ করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আশাবাদী হতে চেয়ে তিনি বলেছেন— 'যদিও মরবার লক্ষণই দেখছি— হিন্দুর জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, দুঃখ দুর্গতির ডালপালা বাড়ছে, তবু প্রাণের ভিতর আশা এই যে, বাঁচব, বাঁচতেই হবে, কোনোমতেই মরব না।'

হিন্দু-সমাজ ও হিন্দু সংস্কৃতি বিপন্ন হলে তা সমস্ত ভারতবর্ষের সমূহ সর্বনাশ ডেকে আনবে জেনে তাঁর সাবধানবাণী— '...আমাদের হিন্দু সমাজের সকল গ্রন্থি যদি শিথিল হইয়া যায় তবে ইহা নিশ্চয় যে, বহু সহস্র বৎসরে হিন্দু জাতি যে অটল আশ্রয়ে বহু ঝড়ঝঞ্ঝা কাটাইয়া আসিয়াছে, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহার স্থানে নতুন আর কিছু গড়িয়া উঠিবে কিনা, উঠিলেও তাহা আমাদিগকে কিরূপ নির্ভর দিতে পারিবে তাহা আমরা জানি না। এমন স্থলে আমাদের যাহা আছে নিশ্চিন্ত মনে তাহার বিনাশ দশা দেখিতে পারিব না।'

'সভ্যতার সংকট' রচনাকালের বেশ কিছু পূর্ব থেকেই তথাকথিত সভ্যতার নগ্নরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'সভ্যতার সংকট' রচনায় রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের প্রতি শুধুমাত্র নিজের অনাস্থাই জ্ঞাপন করেননি, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে বলছেন সদাচার'। উল্লেখ্য, পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে আলোচ্য রচনাকে রবীন্দ্রনাথ যে সুরে বেঁধেছেন, তার আবহ রচনা একান্তই তাৎক্ষণিক ছিল এমন নয়। সেই আবহের প্রতিষ্ঠাভূমি থেকেই রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দুস্থান' কবিতাটির অনুপ্রেরণা অনুসন্ধান নিতান্ত কষ্টকল্পনা বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের আহ্বানও যথার্থই সঙ্গত এবং বলা বাহুল্য, সে আহ্বান সম্ভবত আজও যারপরনাই প্রাসঙ্গিক। □

বিশেষ প্রতিবেদন

পরীক্ষা নামক অক্সিজেন বন্ধ করলে পরিণাম হবে ভয়ংকর

সাধন কুমার পাল

দেশজুড়ে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। ভয়ংকর হয়ে উঠেছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। ভারতে একদিনে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে হু হু করে। দৈনিক মৃত্যু সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে। আবার সেই লকডাউনের ভয়ংকর স্মৃতি আতঙ্ক হয়ে উঁকি মারছে। রোজগার হারানোর, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর, নিঃসঙ্গ কোয়ারেন্টিনের বিষাক্ত ছোবলের, করোনা সংক্রমিত যন্ত্রণাকাতর স্বজনকে সঙ্গ দিতে না পারার মতো অসহনীয় যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে আবার সব কিছু স্বাভাবিক করে নিতে চেয়েছিল মানুষ। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছে যে অন্যরকম, সেজন্য আবার হয়তো মানব সভ্যতাকে নতুন করে পরীক্ষায় বসতে হবে। হতে হবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে করোনার বিষাক্ত ছোবল থেকে রক্ষা করতে আমরা সবার আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করে দিয়েছি। এছাড়া কোনো বিকল্পও ছিল না হয়তো। প্রায় এক বছর পর বন্ধ থাকার পর জায়গায় জায়গায় আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি খোলার ভাবনাচিন্তা হচ্ছিল, খুলেও গিয়েছিল বেশ কিছু। যেমন গত ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্কুলগুলিতে প্রাথমিকভাবে বড়োদের ক্লাস অর্থাৎ নবম, দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস চালু করার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেদিকে তাকিয়ে ৪ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার স্কুল খুললে কী করা যাবে আর কী করা যাবে না সেই সংক্রান্ত একগুচ্ছ নির্দেশিকা সংবলিত ২৮ পাতার গাইডলাইন জারি করেছিল রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তর। তখন মনে হয়েছিল একবছর ঘরবন্দি থাকার পর স্কুলে আসার সুযোগ পেয়ে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে পড়ুয়ারা স্কুলে ফিরবে। কিন্তু সেই অনুমান যে ভুল ছিল স্কুল খোলার পরই তা বোঝা গেল।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১, স্কুল খোলার পর সপ্তাহ খানেক পনেরো থেকে কুড়ি শতাংশ পড়ুয়া স্কুলে আসছিল। কিন্তু এরপর থেকেই পড়ুয়াদের হাজিরা কমতে কমতে দশ শতাংশের নীচে নেমে যায়। ফেব্রুয়ারির শেষ, মার্চের প্রথম দিকের কথা বলছি। তখন মনে দেখেছি একটিই বার্তা, 'ইচ্ছেই করে না স্কুলে যেতে'। কোচিং সেন্টার বা প্রাইভেট টিউটরের সাহায্যে পরীক্ষা প্রস্তুতি সেরে ফেলা, বিগত এক বছরের অনভ্যাস, পরীক্ষা না দিয়ে বাড়িতে বসে থেকেই পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়া ইত্যাদি নানা কারণ থাকতে পারে এই

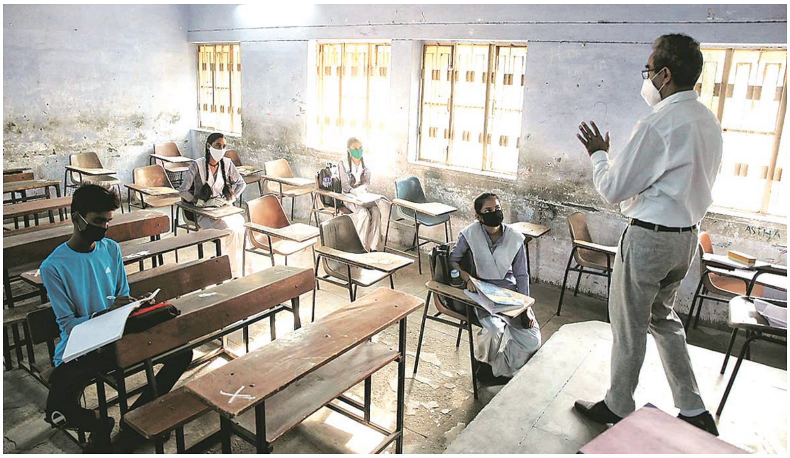

হচ্ছিল করোনা বিদায় নিয়েছে। বাজারে ঘাটে মাঠে ময়দানে বাসে ট্রেনে উপচে পড়া ভিড়; কিন্তু স্কুলগুলি ফাঁকা। সমস্ত ক্লাস চালু করলেও হয়তো এই চিত্রই ফুটে উঠতো। সামনেই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। ক্লাসের প্রয়োজন। সেদিকেই তাকিয়েই করোনা পরিস্থিতির মধ্যেই খোলা হলো স্কুলগুলি। কিন্তু যাদের জন্য স্কুল খোলা হলো তারা কোথায়? পড়ুয়াদের সঙ্গে, অভিভাবকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে স্কুলে না আসার প্রকৃত কারণগুলি বোঝার চেষ্টা করেছি। এই অনুসন্ধানে করোনা সংক্রমিত হওয়ার ভয়ে স্কুলমুখী হচ্ছে না এমনটা মনে হয়নি বরং মোবাইল ফোন আসক্তি, স্কুলের নাম করে বেরিয়ে অন্যত্র সময় কাটানো, করোনাকালে স্কুল না থাকার জন্য পারিবারিক পেশায় জড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি নানা কারণ উঠে এলেও সিংহভাগ পড়ুয়ার শরীরী ভাষায় ফুটে উঠতে

'ইচ্ছে' না করার পিছনে। ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুকে স্কুলে আনতে বছরের পর বছর ধরে সরকারি ও বেসরকারি স্তরে বহু প্রয়াস হয়েছে; পাশ ফেল পর্যন্ত তুলে দেওয়া হয়েছে; চালু হয়েছে সর্বশিক্ষা অভিযান, মিডডে মিলের মতো বহুবিধ বড়ো বড়ো প্রকল্প। করোনা মহামারী সবচেয়ে বড়ো আঘাত হেনেছে বহু যত্নে বহু বছর ধরে গড়ে তোলা 'স্কুল চলো সংস্কৃতিতে'। বিশেষ করে গ্রামবাঙ্গলায় লুপ্ত হতে চলেছে পড়াশোনার সংস্কৃতি। ইতিমধ্যেই শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সংক্রামিত হওয়ার জেরে বেশ কিছু স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সংক্রমণের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী দেখে পশ্চিমবঙ্গে গ্রীষ্মের ছুটি এগিয়ে এনে ১৯ এপ্রিল থেকেই স্কুল ছুটি করে দেওয়া হয়েছে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের জেরে ছুটি ঘোষণা করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে কোয়ারেন্টিনে পাঠিয়ে আবার একবার মরার

উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো বড়ো আঘাত আসতে চলেছে এই 'স্কুল চলো সংস্কৃতিতে'।

এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের তরফে সিবিএসসি-র দশমের পরীক্ষা বাতিল ও ক্লাস টুয়েলভের পরীক্ষা আপাতত স্থগিতের ঘোষণা নতুন করে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। ৪ মে থেকে সিবিএসসি-র দশম ও দ্বাদশের পরীক্ষা শুরু এবং শেষ হওয়ার কথা ছিল ১৪ জুন। দৈনিক করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধির জেরে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল রাজধানীর সব স্কুল বন্ধ থাকবে বলে ঘোষণা করেছেন এবং পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত স্কুল খোলা হবে না। সবার মুখে একটাই প্রশ্ন,কী হবে ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ? পশ্চিমবঙ্গেও ২০২১ সালের ১ জুন থেকে ১০ জুন মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের লিখিত পরীক্ষা শুরু হবে ১৫ জুন, চলবে ২ জুলাই পর্যন্ত। বিভিন্ন বিষয়ের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষাগুলি ১০ মার্চ থেকে ৩১ মার্চের নেওয়া হয়েছে এবং সেই সমস্ত নম্বরও কাউন্সিল অফিসে জমা পড়েছে। সিবিএসই-র দশম শ্রেণীর পরীক্ষা বাতিল হওয়া প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমে এমনটাই প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে রাজ্য সরকার। সরকার মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে সময়মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। অর্থাৎ রাজ্যের মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন উঠে গেল। সন্দেহ নেই পরীক্ষা নিয়ে এই ধরনের সিদ্ধান্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যপক হতাশার জন্ম দেবে, দূরত্ব বাড়াবে পড়াশোনার সঙ্গে।

গত বছর কেরলে করোনার আতঙ্কের মধ্যেই একেবারে নীরবে ১৩ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা নিয়েছে। সে সময় মে মাসে ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যেই স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা আয়োজন করা হলেও পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কোভিডের সংক্রমণ ধরা পড়েনি। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী থমাস আইজ্যাক গত ১৫ জুন ২০২০ সোমবার একটি টুইট করে জানিয়ে ছিলেন, '১৪ দিন আগে ১৩ লক্ষ স্কুলপড়ুয়া তাদের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। একজন পড়ুয়াও কোভিডে আক্রান্ত হয়নি।'

দেশের অন্য রাজ্যগুলি যখন পরীক্ষার সূচি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছে, তখন কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর থমকে থাকার পরীক্ষা শুরু করার ঘোষণা করে দিয়েছিল কেরল।

গত ২৬ মে ২০২০ এই পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। অবশ্যই পরীক্ষা আয়োজন করার জন্য কেন্দ্রের অনুমতির প্রয়োজন ছিল আর কেন্দ্র সে অনুমতি দিয়েও দিয়েছিল। পরীক্ষা শেষ হয়েছিল ৩১ মে ২০২০। রাজ্যের তিন হাজার পরীক্ষাকেন্দ্রে এই পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রত্যেক কেন্দ্রেই দু' জন করে স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল। পরীক্ষার্থী-সহ যাঁরা যাঁরা পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকছেন, তাঁদের স্বাস্থ্যের দিকে কড়া নজরদারি চালানো হয়েছিল। করোনা সংক্রমণ প্রকাশিত হতে প্রায় ১৪ দিন লেগে যায়। সেজন্য পরীক্ষা শেষের ১৪ দিন পর কেরলের অর্থমন্ত্রী থমাস আইজ্যাকের টুইট করে জানিয়ে ছিলেন— '14 days ago 13 lakh school students completed school final exams in Kerala. Not a single student affected by Covid. It was meticulously planned : schools sanitised. Masks distributed to all. Thermal readings mandtory. Physical distancing ensured. Operation success.# covidkerala.

Thomas Isaac (@drthomasisaac) June 15, 2020' সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরীক্ষা চালালে যে সংক্রমণ এড়ানো যায় সেটা আইজ্যাকের এই দাবিতেই স্পষ্ট।

গত ১৭ আগস্ট ২০২০, সেপ্টেম্বরে ন্যাশনাল ইলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রাস টেস্ট (এনইইটি), জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন (জেইই) আয়োজন করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। এই নির্দেশ মেনে ১ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর জেইই ও ১৩ সেপ্টেম্বর নিট পরীক্ষার আয়োজন করেছিল ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির তরফ থেকে জানানো হয়েছিল পরীক্ষার্থীদের থার্মালস্ক্রিনিং করা, স্যানিটাইজার, গ্লাভস, টুপি সরবরাহ করা, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, পরীক্ষা কেন্দ্র স্যানিটাইজ করার মতো সমস্ত রকম স্বাস্থ্য বিধি মেনে প্রয়োজনে করোনা সংক্রমিত পরীক্ষার্থীদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে।

এই নির্দেশ আসতেই দেশজুড়ে রাজনৈতিক ঝড় তুলে দিয়েছিল বিরোধী দলগুলি। নিট-জেইই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় পুনর্বিবেচনার দাবিতে শীর্ষ আদালতে হাজির হয়েছিল ছয়টি রাজ্য। দেশের অ-বিজেপি ছয়টি রাজ্যের মন্ত্রীসভার একজন করে সদস্য এই আবেদন করেছেন। এই ছয়টি রাজ্য হলো পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও ছত্তিশগড়। ১৭ আগস্ট সুপ্রিম কোর্ট রায়ে বলেছিল, 'কেরিয়ার নিয়ে ছেলেখেলা করা যায় না। করোনা আগামী একবছর চলতে পারে। এই একবছর পরীক্ষা বন্ধ থাকবে? জীবন থেমে থাকতে পারে না। তাই সব নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।'

এই রায় পুনর্বিবেচনার দাবিতে ২১ আগস্ট ফের সুপ্রিম কোর্টে দরবার করেছিল ওই ছয়টি অঙ্গরাজ্য। অবশেষে নির্বিঘ্নেই দেশ জুড়ে জয়েন্টএন্ট্রান্স ও নিট সম্পন্ন হয়েছিল। করোনা অতিমারী আবহে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার জন্য পৌঁছাতে সমস্যা হলেও পরীক্ষাকেন্দ্রের ব্যবস্থা দেখে এবং শেষপর্যন্ত পরীক্ষা দিতে পেরে পরীক্ষার্থীরা খুশি। দেশ জুড়ে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সামান্যতম ক্ষোভ বা অসন্তোষও পরিলক্ষিত হয়নি। করোনা আবহে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিলেও কোনোরকম সংক্রমণের খবর আসেনি।

করোনা মহামারীর মধ্যেও দুটি বড়ো পরীক্ষার আয়োজনের দৃষ্টান্ত থেকে এটা স্পষ্ট যে, সংকল্প যদি দৃঢ় হয় তাহলে অসাধ্য সাধন করা সম্ভব। করোনা কবে বিদায় নেবে তা কেউ বলতে পারে না। শিক্ষার মাধ্যমে ছেলে-মেয়েদের জীবন গঠনের প্রক্রিয়াও থেমে থাকতে পারে না। সেজন্য বিকল্প খুঁজতেই হবে। করোনার প্রথম ঢেউয়ের সময় বিভিন্ন বিদ্যালয় নিজেদের উদ্যোগে যে অনলাইন পড়াশুনা চালু করেছিল তার সাফল্য মোটেও উৎসাহব্যঞ্জক নয়। অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে সবাইকে যুক্ত করার মতো পরিকাঠামো নির্মাণ নিয়েও জরুরি ভিত্তিতে ভাবা উচিত। এই নিয়ে 'চলো পড়াই কিছু করে দেখাই' টাইপের 'বড়ো সচেতনতা কর্মসূচি নেওয়া, সেই সঙ্গে কিছু কড়া গাইড লাইনও তৈরি করা প্রয়োজন। যত সংকটই আসুক না কেন পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখতেই হবে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এলোমেলো হয়ে গেলে সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। ▯

করোনাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন মমতা

হীরক কর

আজ থেকে ৫০ বছর আগে মধ্যপ্রদেশের ভিন্দ, গোয়ালিয়র, চম্বল, রাজস্থানের সোয়াই মাধোপুর জেলায় রাত্রিবেলা ঘুমাতে না চাইলে মায়েরা শিশুদের ভয় দেখাতেন— 'সো যা নেহি তো ডাকু আ যায়েগা।' সেই সময় ওই অঞ্চল জুড়ে পুতলিবাই, ফুলন দেবী, মালখান সিংহ গুজ্জরদের দাপট। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় রমেশ সিপ্পি নামে এক ভদ্রলোক ভারতের প্রথম ৭০ মিলিমিটার ফিল্মে সেই ডায়লগ তুলে আনলেন। দূর দূর গ্রামে মা শিশুকে ঘুম পাড়ানোর জন্য বলেন, সো যা নেহি তো গব্বর আ যায়েগা। হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন, ছবির নাম 'শোলে'। আমাদের গ্রামবাঙ্গলাতেও মায়েরা শিশুকে 'জুজু'র ভয় দেখান। সেই জুজু কী বস্তু কেউই জানে না। কেউ চোখে দেখেনি। শোলে ছবির উল্লেখিত শিশুদের মায়েরাও গব্বর সিংহকে কোনোদিন চোখে দেখেননি। আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়েছে সেই অবস্থা। তিনি এখন মানুষকে করোনার 'জুজু' দেখাচ্ছেন।

নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে বলেন, 'হাতজোড় করে অনুরোধ করছি, মানুষের জীবন নিয়ে খেলবেন না।' পরবর্তী ভোটগুলো একদিন বা দুদিনে করার অনুরোধ করেন তিনি। সমস্ত দলের প্রচার-সভা- মিটিং-মিছিল বন্ধ করে দিতে চান তিনি। অথচ তিনিই রাজ্যের স্বাস্থ্য এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তার হাতেই রয়েছে মানুষের করোনা থেকে বাঁচার চাবিকাঠি। পাশাপাশি নিজেই বলেছেন, আতঙ্কের কোনও কারণ নেই। করোনা মোকাবিলায় টাস্ক ফোর্স তৈরি করা হয়েছে। আতঙ্কে নয়, সচেতন থাকতে হবে। রাজ্যজুড়ে ৪০০ অ্যাম্বুলেন্স থাকবে করোনা আক্রান্তদের পরিষেবায়। ২০০ সেফ হোমে ১১ হাজার বেড রয়েছে। ছোটো ছোটো প্রচারসভা করা উচিত। বিভিন্ন হোটেলেও সেফ হোম তৈরি হবে। ইতিমধ্যেই স্কুলগুলোতে গরমের ছুটি শুরু হয়েছে। দিল্লিতে ইতিমধ্যেই জারি হয়েছে ৬ দিনের লকডাউন। তাহলে কি পশ্চিমবঙ্গও এবার একই পথে হাঁটবে? এই জল্পনা যখন তুঙ্গে তখন লকডাউন বা নাইট কার্ফুর সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিন্তু এখনই লকডাউন জারির কোনও পরিকল্পনা নেই। তার কথায়, 'লকডাউন করলেই কি সব বদলে যাবে? লোকের অসুবিধা হবে না! নাইট কার্ফু করে কিছু হবে না। নাইট কার্ফু কোনও সমাধান নয়। ওয়ার্ক ফ্রম হোমে জোর দেওয়া হয়েছে। স্কুলগুলোতে ছুটি দেওয়া হয়েছে।'

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে কাবু পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু এখনই পশ্চিমবঙ্গে লকডাউন বা নাইট কার্ফু জারি হচ্ছে না। কেননা ধরেই নেওয়া যায়, লকডাউন না করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের কাছে 'ভালো মানুষ' সেজে থাকতে চান। করোনা নয়, তাঁর একমাত্র লক্ষ্য বিরোধীদের মিটিং-মিছিল বন্ধ করা। করোনা পরিস্থিতিতে শেষ তিন দফার ভোট একসঙ্গে করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আবেদন জানিয়েছিলেন সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন সাফ জানিয়ে দিয়েছে, তা সম্ভব নয়। আগের নির্ঘণ্ট মেনে পশ্চিমবঙ্গে তিন দফার ভোট গ্রহণ যেমন হচ্ছে তেমনই হবে। করোনা সংক্রমণ বাড়তে থাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে নির্বাচন কমিশনকে ওই চিঠি দেওয়া হয়েছিল। দাবি করা হয় তিন বা দুই দফার ভোট একসঙ্গে

করা হোক। প্রয়োজনে সাতদিন প্রচারের সময়সীমা দেওয়া হোক। সেই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, বাকি দুই দফার ভোট সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় সুরক্ষা বিধি মেনে করতে হবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই বলেছেন 'নবান্ন' দখলের লক্ষ্যে কমপক্ষে ২০০ আসন চাই। তাঁর আশঙ্কা, ২০০-র কম আসন পেলে বিজেপি তার বিধায়কদের কিনে নিতে পারে। কারণ তিনি প্রকাশ্য টেলিভিশন চ্যানেলে স্বীকার করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা 'কাটমানি' খান। বোঝাই যায়, নিজের লোকেদের এখন আর তিনি ভরসা করেন না।

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের নেতাদের ২২টি আসনের লক্ষ্য বেঁধে দিয়েছিলেন অমিত শাহ। শেষ পর্যন্ত ১৮টি আসনে জিতেছে বিজেপি। তবে কয়েকটি আসনে হারের ব্যবধান খুব কম ছিল। এবার বিধানসভা নির্বাচনে কমপক্ষে ২০০ আসন চাই। লক্ষ্য বেঁধে দিয়েছেন খোদ অমিত শাহ।

ষষ্ঠ দফায় ভোটের পর বিজেপি নেতারা দাবি করছেন তারা দুশো আসন পাবেনই। তাই ভোট বিশেষজ্ঞদের মতে, ২২ আসনকে টার্গেট করে যদি ১৮টি লোকসভা আসন পাওয়া যায়। তবে, ২০০ বিধানসভা আসনকে টার্গেট করে ১৮০ থেকে ১৮৫টি আসন পেতেই পারে বিজেপি।

প্রাথমিক রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে উত্তরবঙ্গে ভালো ফলের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গেও আশানুরূপ ফল হবে বলে মনে করছে গেরুয়া শিবির। রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, 'প্রথম ৪ দফায় যে ১৩৫টি আসনে ভোট হয়েছে, আমাদের কাছে যা রিপোর্ট তাতে ৯০ থেকে ১০০টি আসন আমরা পাব।'

চতুর্থ দফা পর্যন্ত যে ১৩৫টি আসনে ভোট হয়েছে তার মধ্যে উত্তরবঙ্গে আলিপুরদুয়ারে পাঁচটি আসন রয়েছে। কোচবিহারে ৯টি আসন। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, লোকসভা ভোটের নিরিখে বিধানসভা ভিত্তিক যা ফলাফল হয়েছিল তা এবারও ধরে রাখা সম্ভব হবে। সেরকম দক্ষিণবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলিতেও আশানুরূপ ফল হবে বলে দাবি করেছেন রাজ্য নেতৃত্ব।

২০১৯-শের লোকসভা ভোটের নিরিখে দেখলে ১৬৪টি বিধানসভা আসনে এগিয়ে ছিল তৃণমূল। বিজেপি এগিয়ে রয়েছে ১২১টি আসনে। লোকসভার সেই ট্রেন্ড বজায় থাকবে কিনা এই বিধানসভা ভোটে তা নিয়ে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা কাটাছেঁড়া করছেন। বুথ থেকে রিপোর্ট নিয়ে তার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান 'গদ্দার' শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, লোকসভা নির্বাচনের ফলের নিরিখে ১২০টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। তাই ক্ষমতায় আসতে দরকার আর ৩০টির মতো আসন। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ সচিবালয় দখলের 'ম্যাজিক ফিগার' ১৪৮। বিভিন্ন সংস্থার সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ১৫০ থেকে ১৬০টি আসনে বিজেপি জয় পেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল বিশ্লেষণ করছেন ভোট বিশেষজ্ঞরা। এরমধ্যে উত্তরবঙ্গের সব জেলা নিয়ে উত্তরবঙ্গ জোন। সেখানে আসন সংখ্যা ৫৪। বিশেষজ্ঞদের হিসাব, ওই জোনে ৩০ থেকে ৩৫টি আসন মিলতে পারে বিজেপির। পাহাড়ে বিমল গুরুং বিজেপির বিরোধিতা করছেন। ফলে সেখানে দার্জিলিং লোকসভা আসনের সাতটি আসনের মধ্যে দুটির বেশি জয় পাওয়া যাবে না বলেই মনে করছেন তাঁরা।

আলিপুরদুয়ারের কালচিনি বিধানসভা এলাকাতেও গুরুংয়ের প্রভাব কাজ করবে। তবে অনেকের মতে, জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় গুরুং-প্রভাব সে ভাবে কাজ করবে না।

এর পরেই নবদ্বীপ জোন। আসন সংখ্যা ৬৩। এই জোনে রয়েছে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনার একাংশ। বিশ্লেষকরা আগাম হিসেব করে বলছেন, এই এলাকায় ২৫ থেকে ৩০টি আসন মিলতে পারে গেরুয়া শিবিরের। হেস্টিংসে বিজেপির ওয়ার রুমের আশা, বনগাঁ ও রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সব বিধানসভা আসনেই জয় পাওয়া যাবে। কৃষ্ণনগর ও বারাসত লোকসভা এলাকা থেকে চারটি করে আসন পাওয়ার আশা করছে তারা।

ভোটবিশ্লেষকদের সমীক্ষা বলছে, লড়াই কঠিন দেগঙ্গা ও রাজারহাট- নিউটাউন আসনে। বসিরহাট লোকসভা এলাকা থেকে একটি আসন মিললেও মিলতে পারে বিজেপির। তবে বিজেপির হিসাব বলছে, অর্জুন সিংহের ব্যারাকপুর লোকসভা এলাকা থেকে আমডাঙা ছাড়া বাকি ছ'টি আসনেই জয় পাবে তারা।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি নিয়ে যারা নাড়াচাড়া করেন তারা সকলেই জানেন, রাজ্যে বিজেপির শক্তিশালী এলাকা রাঢ়বঙ্গ জোন। এই জোনে রয়েছে দুই বর্ধমান জেলা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বীরভূম জেলা মিলিয়ে ৫৭টি আসন। এখানকার বেশ কয়েকটি লোকসভা আসন বিজেপির দখলে থাকায় রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ওই জোনে ৩০ থেকে ৩৫টি আসন পেতে সমস্যা হবে না। বস্তুত, এই জোনের আসানসোল, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ও পুরুলিয়া লোকসভা এলাকার সব আসনেই জয় মিলতে দিলীপ ঘোষ, অমিত শাহদের।

দুই মেদিনীপুর ছাড়াও ঝাড়গ্রাম, হাওড়া ও হুগলি জেলার আসনগুলো নিয়ে জোন মেদিনীপুর। সেখানে রয়েছে মোট ৬৯টি আসন। তৃণমূল ছেড়ে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরে এখান থেকে বড়ো সংখ্যায় আসন মিলতে পারে পদ্ম শিবিরের। ভোট বিশেষজ্ঞদের প্রাথমিক রিপোর্ট বলছে, ৩৫ থেকে ৪০টি আসন আসবে এই জোন থেকে।

রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের লোকসভা কেন্দ্র মেদিনীপুর ছাড়াও ঘাটালের আসনগুলোতে বিজেপি ভালো ফল করবে বলে মনে করেছেন বিশেষজ্ঞরা। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি, তমলুক মিলিয়ে আসতে পারে ১০ থেকে ১২টি আসন। হাওড়া জেলার আসনগুলো নিয়ে এখনও কিছুটা ধন্দ থাকলেও হাওড়া শহরের চারটি

আসনের জয় অন্তত নিশ্চিত। বড়ো সংখ্যায় আসন মিলতে পারে হুগলি, আরামবাগ, শ্রীরামপুর লোকসভা এলাকা থেকে।

শেষপাতে রইল কলকাতা জোন। জোনে হয়েছে ৫১টি আসন। কলকাতা ছাড়া রয়েছে সম্পূর্ণ দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও উত্তর ২৪ পরগনার একাংশ। এই জোনকে 'তৃণমূলের দুর্গ' বলা যেতে পারে। তাসত্ত্বেও বিশেষজ্ঞদের মতো, বিজেপির পক্ষে যে 'হাওয়া' রয়েছে, তাতে এখানেও খাতা খোলা যাবে। এই এলাকায় ১০ থেকে ১২টি আসন মিলতে পারে।

বিধানসভা নির্বাচনে ধর্মীয় মেরুকরণ যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে তা ষষ্ঠ দফার ভোটের পর স্পষ্ট। গত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলেও তার ছায়া দেখা গিয়েছিল। পদ্মশিবিরের অনেক নেতারই দাবি, আসন্ন নির্বাচনে হিন্দু ভোট গেরুয়া শিবিরের পক্ষে অনেকটাই এককাট্টা হবে। তাই ভোট বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, বাঙ্গলায় মুসলমান-অধ্যুষিত ৬০টির মতো আসন নিয়ে লড়াই তৃণমূলের। বাম-কংগ্রেস জোট লড়াই ১৫টির মতো আসন নিয়ে। ফলে বিজেপির 'সহজ লড়াই' অব্যাহত ২২০টির মতো আসনে।

তবে আগাম হিসেবনিকেশের ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় ভাবাচ্ছে বিশেষজ্ঞদের। তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'সারদা-কাণ্ড' এবং 'নারদা' নিয়ে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়া তৈরি হলেও তা একাই থামিয়ে দিয়েছিলেন তৃণমূলনেত্রী। ভোটের ঠিক আগে 'নারদাকাণ্ড' প্রকাশ্যে আসার পরেও নিজের ভাবমূর্তি দিয়ে যে ভাবে তিনি দলের জয়কে বিপুল আকার দিয়েছিলেন, সেটা এবারের ভোটেও ভাবার বিষয়। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই জানেন, তার ৫০০ কোটির পরামর্শদাতা প্রশান্ত কিশোরের 'দিদিকে বলো' কর্মসূচি থেকেই উঠে এসেছে গ্রামবাঙ্গলায় তৃণমূল নেতাদের কাটমানি খাওয়ার কথা। তাই এবার নীচু তলায় তৃণমূল বিরোধিতার অন্যতম কারণ 'কাটমানি'। তাই দিমিণির যতই বেনিফিসারি থাকুক না কেন, সেই বেনিফিসারিরাই ছয় ছয়টি দফা ধরে উলটো পথে ভোট দিয়ে চলেছেন। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে বিজেপির ঝুলিতে চলে যাবে ১৮০ থেকে ১৮৫টি আসন।

তাই শেষ দুই দফায় বিরোধীদের প্রচার, রোড শো, সভা-সমাবেশ আটকাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান অস্ত্র 'করোনা'। করোনা ঠেকাতে নিজে লকডাউন করার কথা উড়িয়ে দিলেও তিনি মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন একটাই 'জুজু'। ভাবটা এমন, 'সো যা বেটা, নেহি তো 'করোনা' আ যায়েগা'।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

মাননীয়া করোনা নিয়ে রাজনীতি করবেন না

বিশ্বপ্রিয় দাস

করোনার দ্বিতীয় সুনামি আছড়ে পড়েছে সারা দেশে। আমাদের রাজ্যে গত বছরের তুলনায় এই সংক্রমণের ধারা একেবারে ঝড়ের গতিতে। এই প্রতিবেদন যখন লিখছি, সেই দিন (২১ এপ্রিল, ২০২১) পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ৬৭৮১৭২, এর মধ্যে অ্যাক্টিভ ৫৮৩৮৬, সেরে বাড়ি ফিরেছেন ৬০৯১৩৪, মৃত্যুর খাতায় নাম লিখিয়েছেন ১০৬৫২। (সূত্র : কোভিড-১৯ ট্র্যাকার, মাইক্রোসফট উইং)। ঠিক এক বছর আগে, এই দিনে সংবাদপত্রের পাতায় লেখা হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৫৩। মোট ৩৯২। ৭৩ জন চিকিৎসার পর ছাড়া পেয়েছেন, কেড়ে নেওয়া জীবনের সংখ্যা ১২।

চিত্রটা কেমন যেন পালটে গেল এক বছরে। এক বছর আগে বিষয়টা ছিল অজানা। আর এ বছর বিষয়টা জানা সত্ত্বেও আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই নিয়েও রাজনীতিতে মেতেছেন। তিনি করোনাকে ভোটের রাজনীতিতে ইস্যু বানিয়েছেন। নিজের দোষ ঢাকতে গলাবাজি করছেন। মানুষকে মৃত্যুর কার্পেটে প্রতিদিন আহ্বান জানিয়ে তিনি এখন সাধু মাতা সাজছেন। এক আদর্শের প্রতিভূ সাজছেন। মাননীয়া আপনি তো নানা বিষয়ে পড়াশোনা করেন, আপনি নিজেই প্রকাশ্যে বলে থাকেন। তাহলে বিশেষজ্ঞরা যখন গত বছর এই দ্বিতীয় ঢেউ নিয়ে সতর্কবাণী দিয়েছিলেন, সেটা নিশ্চয়ই আপনার জানা। তাহলে আপনাকে নতুন করে আবার করোনার জন্য সেফ হোম, হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা নিয়ে, চিকিৎসক নিয়ে, চিকিৎসা প্রদান নিয়ে ভাবতে হচ্ছে কেন? আপনি নাকি সারা দেশকে পথ দেখাতে অভ্যস্ত। তাহলে আপনি এই দশ মাস হাতে সময় পেয়েছেন, কী করলেন এই সময়ে? কোন রাজ্যে কী হলো সেটা নিয়ে আমাদের রাজ্যবাসীর মাথাব্যথা নেই। প্রত্যেকে এখন নিজের ঘর বাঁচাতেই ব্যস্ত। আপনি অবিবেচকের মতো হাসপাতালগুলিতে করোনা রোগীদের জন্য শয্যা সংখ্যা কমিয়ে দিলেন। এমনকী ‘সারি’ ওয়ার্ডের অবলুপ্তি ঘটালেন। আপনি ঢাক ঢোল পিটিয়ে নানা বিশেষজ্ঞ, নোবেল লরিয়েটদের নিয়ে একটি

কমিটি বানালেন। তাঁরা নিশ্চয়ই আপনাকে এই বুদ্ধি দেননি যে আপনি আত্মতুষ্টিতে ভুগে মানুষকে আবারো সেই অতলে ঠেলে দেবার ব্যবস্থা করে রাখুন।

আপনি কেন্দ্রের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন। আপনি কি অস্বীকার করতে পারবেন, কেন্দ্র আপনাকে এই অতিমারীকে ভবিষ্যতে রোখার জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য কোনো আর্থিক সাহায্য করেনি? আপনি কি অস্বীকার করতে পারবেন, হাসপাতালগুলিকে আরও আধুনিকতায় সাজাতে আপনাকে সাহায্য করেনি? আপনি কি অস্বীকার করতে পারবেন, কেন্দ্র হাত গুটিয়ে এই দশ মাস সময় ধরে বসে আছে? কেন্দ্র এর মধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে কমদামে করোনা ভ্যাকসিন বানিয়ে ফেলেছে দেশবাসীকে রক্ষা করার জন্য। আর সেটা বিনামূল্যে দেশবাসীকে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে সাধ্যমতো। আপনি আবার প্রশ্ন তুলেছেন, বাইরের দেশকে কেন দেওয়া হলো এই ভ্যাকসিন, আমাদের সবাইকে আগে না দিয়ে। হয়তো ভুলে গেছেন, আমাদের প্রতিবেশী দেশ আমাদের থেকে আরও অসহায়। আমরা নিজেরা যখন ভ্যাকসিন বানাতে পারছি, যে কোনো সময় আমাদের চাহিদা মতো বানাতে শুরু করেও ফেলেছি। তাই সামান্যতম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে আমাদের প্রতিবেশী পরিজনদের বাঁচাবার চেষ্টা করছে আমাদের সরকার। এটা হয়তো আপনার অভিধানে লেখা নেই। কেননা আপনি তো শুধুই আপনার একমাত্র ভাইপোর কথাই ভাবেন।

আপনি নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারবেন গত বছর এই সময়ে সামান্য করোনা টেস্টিং কিটের জন্য অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে আমাদের থাকতে হয়েছে। আপনার কেন্দ্রকে বাহবা দেওয়া উচিত যে এই কিট আমরা গত দশ মাসে নিজেরাই বানিয়ে ফেলেছি নিজেদের শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানীদের সাহায্যে। কেন্দ্রীয় সরকারকে গালিগালাজ বা দোষ দেবার আগে নিজে একবার নিজের দিকে তাকান।

যখন আবার মানুষ করোনায় মরছে, সেই সময়ে একটি নতুন টাস্ক ফোর্স করোনা মোকাবিলায় এই সবে মাত্র কয়েকদিন আগে বানালেন। আপনি তো জানতেন, কোভিড নির্মূল হয়নি। তাহলে নতুন করে, আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হচ্ছে কেন? কেন ধারবাহিক ভাবে এই মোকাবিলার জন্য বাহিনী তৈরি করে রাখা হলো না? কেন হাসপাতালে তুলে দেওয়া হলো আলাদা করোনা চিকিৎসা ব্যবস্থা, কেন কমিয়ে দেওয়া হলো শয্যা, কেন খুললাম খুল্লা খুলে দেওয়া হলো সব? কেনই-বা কড়াকড়িভাবে করোনা বিধি মেনে চলতে বাধ্য করা হলো না?

আপনি কেন্দ্রের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন। আপনি বলুন তো, করোনা ভ্যাকসিন কি নারকেলের নাড়ু, আপনি ইচ্ছা মতো বানিয়ে নিতে পারেন বাড়িতে? সেগুলি যে সংস্থা বানাচ্ছে, তাঁদের একটা নিজস্ব ক্ষমতা আছে। সেই অনুযায়ী বানাচ্ছে। আমরা নিজেরা এখন নিজেদের দেশে, একেবারে নিজেদের ভ্যাকসিন বানাচ্ছি। এটা ভেবে ভারতবাসী হিসেবে আপনার গর্ব হয় না? আমাদের মতো গরিব দেশ এক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হয়ে উঠল। আপনি কেন মেনে নিতে পারছেন না মোদী সরকারের সাফল্যকে?

মাননীয়া এখনও সময় আছে, আপনি নিজেকে আর নিজের ভাইপোকে নিয়ে চিন্তা না করে রাজ্যের সাধারণ মানুষের কথা ভাবুন।

জ্ঞানবাপী মসজিদে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ পরীক্ষা করবে

১৯৯১ সালের একটি দেওয়ানি মামলায় ‘স্বয়ম্ভু জ্যোতির্লিঙ্গ ভগবান বিশ্বেশ্বর’— এই মামলায় আবেদনকারীর একটি দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে, সদ্য বারাণসী জেলা আদালত ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগকে আদেশ জারি করেছেন। ওই আদেশে, আদালত পুরাতত্ত্ব বিভাগকে ‘কাশী বিশ্বনাথ মন্দির-জ্ঞানবাপী মসজিদ’-এ বিশেষ পরীক্ষানিরীক্ষা করে আদালতকে জানাতে বলা হয়েছে যে, জ্ঞানবাপী মসজিদ নির্মাণে পূর্ববর্তী কোনো ধর্মীয় নির্মাণকে পরিবর্তন অথবা পূর্ববর্তী নির্মাণের ওপর কোনও কিছু আরোপ করা হয়েছে কিনা।

প্রসঙ্গত, ১৯৯১ সালে বারাণসী আদালতে বারাণসী মন্দির ন্যাস-এর পক্ষ থেকে একটি মামলা করা হয় যেখানে আদালতকে ঘোষণা করার আর্জি জানানো হয়েছে যে, ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করে তার ওপর মসজিদ নির্মাণ করে— যে মামলা আজও বিচারাধীন।

—**অভিজিৎ চক্রবর্তী,**
কলকাতা-৬।

সেনাবাহিনী দেশের সম্পদ

কোচবিহারের শীতলকুচির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সারা রাজ্য জুড়ে কালা দিবস পালন করে শাসক দল এবং তার অনুগামীরা। তাতে কোনো অসুবিধা নেই। এটা গণতান্ত্রিক অধিকার। সেই কালাদিবসে বাঙ্গলার তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা বলছেন বহিরাগত কেন্দ্রীয়বাহিনীর হাতে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। কী সাঙ্ঘাতিক ভয়ংকর বাজে কথা সেনাবাহিনীর সম্পর্কে! কী পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয়বাহিনী গুলি চালিয়েছে তা সবাই জানে। কোচবিহারের শীতলকুচিতে প্রকাশ্য জনসভায় যে কেন্দ্রীয়বাহিনীকে আটক রাখার নিদান দেওয়া হয়েছিল সে কথা কেউ বলছে না।

বাঙ্গলার তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা যে ভাষায় সেনাবাহিনীকে বহিরাগত বলেছেন তার তীব্র নিন্দা করি। ধিক্কার জানাই ওই বুদ্ধিজীবীদের। মনে রাখতে হবে, সেনাবাহিনী আমাদের দেশকে, আমাদের জাতিকে জীবন দিয়ে রক্ষা করছেন। বাঙ্গলার এক শ্রেণীর স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীদের বলছি, একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করছেন করুন, অপ্রিয় রাজনৈতিক দলগুলোকে কু-ভাষায় ভরিয়ে দিচ্ছেন দিন, রাজনৈতিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করছেন করুন, কিন্তু সেনাবাহিনীকে বহিরাগত বলবেন না। তাদের সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করবেন না। ওই সেনাবাহিনীর জওয়ানরাই তাদের সংসার, মা, বাবা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ছেড়ে এসে নির্বিঘ্নে ভোট করানোর জন্য এত দূরে পড়ে আছেন।

সেনাবাহিনী কোনো রাজনৈতিক দলের নয়। তারা এই দেশের,এই ভারতবর্ষের রক্ষাকর্তা। ভুলে গেলে চলবে না ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্যই আমরা রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি। দেশকে অখণ্ড রাখতে পারি। বাঙ্গলার তল্পিবাহক বুদ্ধিজীবীরা বুদ্ধিটা মাথায় রাখুন, অন্য কোথাও নয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের গর্ব, আমাদের সম্পদ।

—**নরেশ মল্লিক,**
জামালপুর, পূর্বস্থলী ২, পূর্ব বর্ধমান।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে এত হিংসাত্মক ঘটনা ঘটার কারণ কী

নির্বাচন সে পঞ্চায়েত, মিউনিসিপালিটি, করপোরেশন, অ্যাসেম্বলি বা পার্লামেন্ট যাই হোক না কেন পশ্চিমবঙ্গে হানাহানি মারামারি, খুনোখুনি, রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কেন? অন্যান্য রাজ্য অসম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যে যখন নির্বাচন হয় তখন তো এত হানাহানি, মারামারি, খুনোখুনির সংবাদ প্রকাশিত হয় না। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে এত খুনোখুনি রক্তপাতের কারণ কী? পশ্চিমবঙ্গবাসী কি খুবই হিংস্র প্রকৃতির? কিন্তু তা তো নয়। বরং অন্যান্যদের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গবাসী অনেকটাই নিরীহ প্রকৃতির। তাহলে? পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা মোটামুটিভাবে ১০ কোটি। এদের মধ্যে প্রায় ৩ কোটি মিয়াভাই। ওরা স্বভাবত একটু উগ্র প্রকৃতির। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের শীতলকুচিতে ভোটচলাকালীন যে নির্মম ঘটনা ঘটেছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে যে ৪ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছে তারা সবাই মিয়াভাই। সংবাদে প্রকাশ, এরা এতটাই উগ্র এবং উত্তেজিত ছিল যে তারা কেন্দ্রীয় বাহিনীর রাইফেল ছিনতাই করতে সক্রিয় হয়েছিল।

ফলে কেন্দ্রীয় বাহিনী গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছিল। আর একজন ভোটার আনন্দ বর্মনও প্রথমবার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে এসে লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যু বরণ করলেন। নির্বাচন তো এখনো বাকি। আরও কতজনের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করতে হবে আমাদের কে জানে! কিন্তু কেন? অন্যান্য রাজ্যে সচরাচর যা ঘটে না আমাদের রাজ্যে তা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। কারণ এক শ্রেণীর রাজনীতিকদের প্রত্যক্ষ প্রশ্রয় ও উসকানি। তারা যেন তেন প্রকারে ক্ষমতা হস্তগত করতে চায়। আর এজন্য সাধারণ কর্মীদের যদি কিছুটা হলেও ভোকাল টনিকের ব্যবস্থা করা যায় তো মন্দ কী? আর এজন্য সাধারণ কর্মী এবং সমর্থকদের যদি কিছুটা খেসারত দিতে হয় রক্তপাত হয় বা প্রাণহানি ঘটে, ঘটতেই পারে। বড়ো কিছু পেতে গেলে ওসব ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না। কিন্তু মূল প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে। অন্যান্য রাজ্যে সচরাচর যেটা ঘটে না আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সেটা ধারাবাহিকভাবে ঘটে চলেছে কেন? সব কিছু পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এক শ্রেণীর মানুষের উগ্র মনোভাব এইসব হিংস্রতার মূল কারণ।

তাই যতদিন এদের হিংস্র মনোভাবের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভবপর না হচ্ছে ততদিন এ ধরনের ঘটনা ঘটতেই থাকবে। যখন এদের নিষ্ক্রিয় করে রাখা প্রয়োজন তখন কয়েকটি রাজনৈতিক দল এদের ক্রমাগত উস্কানি দিয়ে উত্তেজিত করে তুলছে। এরা এতটাই বেপরোয়া যে বুথ দখল করতে চেষ্টা করে, বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের ভোট না দিতে যাওয়ার জন্য হুমকি দেয়।

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়োবাজার,
চন্দনগর।

এ নির্বাচন শুধু নির্বাচন নয়

এবারের নির্বাচন শুধু নির্বাচন নয়, শ্যামাপ্রসাদের হাতে গড়া বাঙ্গলার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। এ নির্বাচন হলো বাঙ্গালি হিন্দুর টিকে থাকার লড়াই। এ নির্বাচনে স্থির হবে বাঙ্গলা ভারতের অঙ্গরাজ্য থাকবে না ইসলামিক বাংলাদেশে অঙ্গীভূত হবে। তাই আর পাঁচটা নির্বাচনের মতো ভাবলে চলবে না। আমরা চিরকালই যে কংগ্রেসকে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখেছি, আজ তারা হাতে হাত মিলিয়েছে, আর তাদের নেতা তথা আব্বা হচ্ছে ইসলামিক টুপি পরিহিত সেকুলার আব্বাস সাহেব। বাঙ্গলায় আজ যে ছেচল্লিশের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, তারা মূল কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, মুসলিম লিগের দীর্ঘ সাত দশকের কর্মসূচির ফসল। সেদিন আমরা দেখেছিলাম কমিউনিস্ট নেতা গঙ্গাধর অধিকারীর জাতিসত্তা তত্ত্ব, কমিউনিস্ট নেতা নিখিল চক্রবর্তীর দ্বারা মুসলিম লিগের ম্যানিফেস্টো লেখা, আর পঞ্জাবের মুসলমান কমিউনিস্ট নেতা দানিয়েল লতিফের দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম লিগের নির্বাচনী ঘোষণাপত্র তৈরিতে ডিকটেশন দেওয়া।

আজ বাঙ্গলায় আবার সেই পরিস্থিতি গড়ে তুলতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। কেউ ত্বহা সিদ্দিকির পা ধরছে, তো কেউ আব্বাস সিদ্দিকির চরণতলে লুটোপুটি খাচ্ছে। বাঙ্গলা ধীরে ধীরে পাকিস্তানের পথে এ ভাবেই যাচ্ছে। one step forward for a Pakistan in West Bengal by the activities of political party, state government and intellectual person. আমরা দেখেছি, ছেচল্লিশ সালে সইদ সোহরাওয়ার্দি, আবুল হাশেম, শরৎ বসু, সত্যরঞ্জন বক্সী প্রমুখর চিন্তা ভাবনায়, অখণ্ড, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাঙ্গলা গড়ে তুলতে কী আপ্রাণ চেষ্টা করে ছিল, জিন্নার দৃষ্টিতে যা ভবিষ্যতে পাকিস্তানের ক্ষুদ্র সংস্করণই হতো, তা শ্যামাপ্রসাদ বুঝতে পেরে, নেকড়ের মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে হিন্দুদের জন্য এই বাঙ্গলা গড়ে তোলেন, তার ভবিষ্যৎ আজ হায়নার মুখে এসে ঠেকেছে। এ বিপদ থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে হবে আমাদেরই। নচেৎ আমাদের দশা হবে পূর্ববাঙ্গের হিন্দুদের মতোই। ১৯৪৭ সালের সময়, যে অখণ্ড বাঙ্গলায় হিন্দু মুসলমানের অনুপাত ছিল ৪৮ : ৫২, দেশ ভাগ করে নেওয়ার পর, সেই পূর্ববাঙ্গলায় প্রায় উনত্রিশ শতাংশ (১৯৪১ সালের জনগণনায়) ছিল, যেখানে হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের ছড়াছড়ি ছিল, হিন্দু জমিদারদের জমিদারি ছিল, কবি সাহিত্যিকগণের সাতপুরুষের জন্মভিটে ছিল, রাজনীতিবিদদের চারণভূমি ছিল, ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত ছিল, গোলা ভর্তি ধান ছিল, পুকুরে নানান ধরনের মাছ ছিল, গোয়ালভরা গোরু ছিল, বিরাট বিরাট দালান বাড়ি ছিল, মঠ মন্দির ছিল, চাকরবাকর, লোকলস্কর ছিল। সবই ত্যাগ করে, সাতপুরুষের জন্মভিটে ছেড়ে চলে আসতে হলো। ভাতের অভাব হয়নি, ঘরও ঝড় জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায়নি, তবুও আসতে হলো। যারা আসতে পারল না বা এল না, তাদের দশা হলো নোয়াখালির রায়চৌধুরী পরিবারের মতো। প্রত্যহ লুঠ, অগ্নিসংযোগ, অত্যাচার, সম্পত্তি জবরদখলের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মেয়েয়েদের সম্ভ্রমহানি। রাতের পর রাত ধর্ষণের শিকার সহ্য করতে না পেরে এই রায়চৌধুরি পরিবারের সদস্যদের শেষ পর্যন্ত ইসলামই কবুল করে নিতে হয়। এভাবে পূর্ববাঙ্গলায় হিন্দুর সংখ্যা আজ প্রায় আট শতাংশে নেমে এসেছে। বর্তমানে তৃণমূলের এক সবজান্তা এমপির পশ্চিম পাকিস্তানের জন্মস্থান ছেড়ে আসা বংশধরদের উপর অনুরূপ অত্যাচার ও দমন হওয়ায় সেই খ্রিস্টান পরিবারেরও ইসলামীকরণ হয়ে গেছে।

এই মহা দুর্দিনে, বামফ্রন্ট, মা-মাটি-মানুষের সরকারের কাজকর্ম যেন মক্কা মদিনা মহম্মদের সরকারের রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ফলে বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীগণ আজ কেউ-বা জয়চাঁদ, কেউ-বা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলপন্থী হয়ে গেছে। বাংলা ভাষার আরবীকরণ হয়ে গেছে। এহেন অবস্থায় শ্যামাপ্রসাদপন্থীরাই পারে এই বাঙ্গলার হৃতসংস্কৃতি ও সভ্যতার পুনরুদ্ধার করতে। তাই এবারের নির্বাচন এক দিকে যেমন, প্রতি হাতে কাজ, পরিবেশ বান্ধব শিল্প ও কর্মসংস্থানের পুনরুজ্জীবন, তোলাবাজি, জুলুমবাজি, সিন্ডিকেটরাজ ও ইসলামিক সন্ত্রাসের অপসারণ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের দূরীকরণ, উচ্চশিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা। প্রশাসনকে দলদাসের কবল থেকে রক্ষা করার, সঙ্গে সঙ্গে বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধন, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তন করা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন, গোমাতাকে জাতীয় পশু বলে ঘোষণা, শিক্ষার ভারতীয়তকরণ- সহ জাতীয় মহাকাব্যকে আবশ্যিক করা, লাভজেহাদ, ধর্মান্তরকরণ রোধ, ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে দেশ ও রাজ্যে স্বাভিমান ফিরিয়ে আনা।

সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের হাতে গড়া বাঙ্গলাকে রক্ষা করার জন্য যারা আপামর বাঙ্গালির কথা ভাববে, যারা বাঙ্গলাকে ভারতের অঙ্গীভূত রাখবে, বিচ্ছিন্ন করার মতো কোনো কর্মসূচির নামকরণ করা হবে না, যে সাভারকরের মতো কোদালকে কোদালই বলবে, সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে পারবে। নচেৎ পূর্ববাঙ্গলার হিন্দুদের মতো সব কিছু থেকেও কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে সাতপুরুষের জন্মভিটে ছেড়ে চলে যেতে হবে ওড়িশা বা বিহার রাজ্যে।

—**রাধাকান্ত ঘোড়াই,**
ডাবুয়াপুকুর, পূর্ব মেদিনীপুর।

নারী নিগ্রহ একটি সামাজিক ব্যাধি

নন্দিতা দত্ত

হিউমেন রাইটস ওয়াচ প্রোজেক্টের এক তথ্য থেকে জানা গেছে, ভারতে প্রতি বছর প্রায় ৭,২০০ জন শিশু ধর্ষিত হয়। অথচ ৫-৬ শতাংশ ঘটনা পুলিশের খাতায় নথিভুক্ত হয়। নথিভুক্ত না হওয়ার প্রধান কারণ, মৃত্যুভয় দেখিয়ে পরিবার পরিজনকে আইনের দরজায় যেতে না দেওয়া। তারপর আর্থিক দুর্দশার কারণে, অশিক্ষার কারণে গরিব মানুষগুলো নিজেদের লুকিয়ে রাখে। কতিপয় ঘটনাই মিডিয়াতে আসে। দু'-চারদিন হই-চই তারপর সবাই সব কিছু ভুলে যায়। কিন্তু সেই ধর্ষিতা শিশু, কিশোরী, যুবতী কি কখনও ভুলতে পারে তার শারীরিক কষ্ট, মানসিক কষ্ট? তার খবর আমরা ক'জন রাখি?

অথচ আমাদের দেশে রয়েছে যৌন অপরাধ থেকে শিশু সুরক্ষা আইন, ২০১২। অথচ উদ্বেগজনক ভাবে শিশুদের উপর নানাবিধ যৌন নির্যাতন ও হয়রানির ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। প্রতিবছর অসংখ্য মেয়ে শৈশবেই ধর্ষণ ও হত্যার বলি হচ্ছে। ১৮ বছরের নীচে শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন ও হয়রানির অভিযোগে দ্রুত বিচারের জন্য বিশেষ আদালত ও সরকারি আইনজীবী নিয়োগের কথা রয়েছে এই আইনে। বাস্তব কী? শিশুর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন হলে ১০ বছর কারাদণ্ড, কোথাও সর্বোচ্চ সাজা আজীবন কারাবাস। বাস্তবে কি তেমনটা হচ্ছে? পুলিশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণ লোপাটের কাজে ব্যস্ত।

ভোগলিপ্সা, ভগ্ন পারিবারিক সম্পর্কগুলোকে বার বার দায়ী করা হচ্ছে এ ধরনের ঘটনাগুলোর মূলে। সাধারণভাবে যদি একটি বস্তির জীবনযাপনকে দেখি, সেখানে যে জীবন তার থেকে নিম্ন- মধ্যবিত্তের বাড়ির চিত্র কিছুটা আলাদা। মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত প্রত্যেকটি পরিবারের নিজস্ব জীবনধারার মধ্যে দিয়ে সন্তান বড়ো হয়। আর্থিক বৈষম্য যাই থাক পরিবারগুলোর মধ্যে একটা অদ্ভুত মিল থাকে। ছোটোবেলা থেকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহু সন্তান তার মাকে অসম্মানিত হতে দেখতে দেখতে বড়ো হয়। ভালোমন্দের দায়ভার কাঁধে নিয়ে মায়েরা স্বামীর হাতে মার খেতে খেতে সন্তানকে বড়ো করে। এরপরেও সে সন্তান কীকরে একজন নারীকে সম্মান করা শিখবে? ব্রোকেন ফ্যামিলির সন্তান বড়ো হয় এক অনিশ্চিত নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিয়ে। বাবা-মায়ের কলহ, নিত্য মারপিঠ, অসম্মান দেখতে দেখতে সে সন্তান কখনওই ভাবতে পারে না তার মা'ও ভালোবাসা পেতে পারে। যৌথ পরিবারে এ ব্যাপারগুলো মাথাচাড়া দেয় না। কারণ অনেক শিশু একসঙ্গে বড়ো হয়। বড়োদের অসন্তোষ ক্ষোভগুলো তাদের চোখের সামনে আসে না। এখন এককোশী পরিবারে যা হচ্ছে তা সন্তানের চোখের সামনেই হচ্ছে। বাবা-মায়ের অসন্তোষের ক্ষোভের আঁচড়ে শৈশব ছিন্নভিন্ন। তার উপর আত্মকেন্দ্রিকতায় অন্যকে টেক্কা দিতে গিয়ে লোভ কিছু কিছু মানুষের এমন জায়গায় পৌঁছেছে যার ন্যায় অন্যায় বোধ থাকে না।

অর্ধশিক্ষিত, বস্তিতে বসবাসকারী সন্তানরা বড়ো হয় বাবা-মায়ের ঝগড়া দেখতে দেখতে। যেখানে অধিকাংশ সময়ই নেশাগ্রস্ত বাবা বলপূর্বক স্ত্রীকে ভোগ করে, সন্তানের চোখের সামনেই। অবশ্য যে যেরকম আর্থিক ক্ষমতার মধ্যেই থাকুক না কেন, পুরুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর ইচ্ছা অনিচ্ছাকে গুরুত্ব দেয় না। তাই বিবাহোত্তর ধর্ষণ সহ্য করে তারা। হাতে গোনা দু-চার জন প্রতিবাদ করলে তার ভাগ্যে যা জোটে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ঘরের ভিতরের এ ঘটনাগুলো নিয়ে নারী-পুরুষ কেউ ভাবে না। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এখন অনেক বেশি বুদ্ধি সম্পন্ন। বাবা-মায়ের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁরাও কিছু শর্ত চাপায়। নিজের অসংযত আচরণের জন্য বাবা-মা ছেলে-মেয়েকে শাসন করতে পারে না। বা কোথায় শাসন করতে হয় সেটাও জানে না। পরিবারের ভিতরের এই ঘুণ ধরা সম্পর্কে নড়বড়ে হয়ে যায় সন্তানের চালচলন। শাসন করাটাও সঠিক সময়ে হয় না। সেই ছেলেরা কাউকেই তোয়াক্কা করে না। অক্ষর জ্ঞান থাকলেই যেমন শিক্ষিত হয় না, তেমনি অনেক শিক্ষিত লোক নিজেদের সংশোধন করার কথা ভাবে না।

বলিউডি সিনেমা এবং টিভি সিরিয়ালে যেভাবে কাহিনি সাজানো হয়, তা একটি প্রজন্মকে অনায়াসে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। এ ধরনের নেতিবাচক কাণ্ডকারখানা প্রতিনিয়ত দেখে কিছু মানুষ আনন্দ পায় নিজের মনের অবদমিত ইচ্ছাপূরণের হাতিয়ার হিসাবে। এবং বিশ্বাস করতে করতে অনায়াসে নিজেও অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এ ধরনের আচরণে, যা তার কাছে স্বাভাবিক। এছাড়া রয়েছে লিঙ্গবৈষম্য। লিঙ্গবৈষম্য আমাদের এমন জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যে, মেয়েদের পক্ষে কথা বললে তিনি নারী বা পুরুষ যাই হোন না নারীবাদী বলে ব্যঙ্গ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে পুরুষবাদ বা নারীবাদ নয়, মানবতাবাদই একমাত্র রক্ষা করতে পারে সমাজের এই স্খলনকে। ◘

মনের চাপ কমান গান শুনে

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

সুনন্দার একমাত্র মেয়ে রিমা। কয়েকদিন ধরেই মনমরা। ইদানীং কথা কম বলে। সব সময় অন্যমনস্ক। খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো করছে না। যে মেয়ে সারা দিনের ক্লান্তির পরে রাত দশটাতেই ঘুমিয়ে পড়তো, সে এখন রাত বারোটাতেও ঘুমোতে পারে না। কিছুদিন হলো মোবাইল-ই যেন ওর বড়ো সঙ্গী। বাবা-মাকেও কেমন দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আগের মতো আর গল্পগুজবও করে না।

কেন এমন হলো? এর পরিণতিই-বা কী?

'আসলে ওর মনের ওপরে বেশি চাপ পড়ছে। শুধু টিনএজার কেন, এই প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা একাধিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায় না-ঘরকা, না-ঘাটকা। নানা দ্বন্দ্ব, ঘাত-প্রতিঘাত এবং শেষমেশে অবসাদ ও ডিপ্রেশনের মুখোমুখি হওয়া এখন নিত্যনৈমিত্তক ব্যাপার'— বলছেন কলকাতার বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়।

বিজ্ঞানের সুফল এখন ঘরে ঘরে। পরিণতিরও নানা রূপ। বিজ্ঞানের এই ঢেউ কোনো কিছুকেই আর অজানা রাখেনি। ফলে হাতের কাছে একটি মোবাইল থাকলেই এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে বড়ো বেশি 'জেনে ফেলা'। সম্পর্ক ও সমস্যা— এই দুইয়ের মধ্যে মিল যত, দূরত্বও ততটাই। আর সেই সম্পর্ক হতে পারে স্বামী-স্ত্রীর, ননদ-বউদির কিংবা সন্তানের সঙ্গে বাবা-মায়ের।

'প্রেম-ভালোবাসা করে একমাত্র ছেলের বিয়ের পর থেকে মায়ের মনে এমন সব প্রতিক্রিয়া হলো, যার পরিণতিতে তিনি গভীর 'মানসিক রোগ'-এর শিকার হলেন। প্রথম দিকে কিছু ওষুধ ও পরে দীর্ঘদিনের কাউন্সেলিং-এর পর তিনি এখন অনেকটাই সুস্থ। সংসারে নতুন মেয়ের আগমনে তাঁর মনে হয়েছিল, ছেলে বুঝি আর আগের মতো 'নিজের' রইল না। অনেক ঘটনার এটি একটি সামান্য উদাহরণ।' কথার ছলে এমনই নানা প্রসঙ্গ তুলে ধরলেন ডাঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়।

তবে হাল আমলে ছোটোদের মধ্যেও মানসিক দোলাচল অনেক বেড়েছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগের। কিন্তু কেন এমন হলো? এই নিয়ে একটি সুন্দর উদাহরণ দিলেন কলকাতার এক সুপরিচিত মনোরোগ কেন্দ্রের প্রবীণ বিশেষজ্ঞ। তিনি বললেন, 'এর জন্য দায়ী অভিভাবকরা। স্কুলের গণ্ডি পেরোতে না পেরোতেই ছেলে-মেয়েদের হাতে স্নেহের নির্দশনস্বরূপ একটি মোবাইল তুলে দেওয়া হয়। শুরু সেই থেকেই। শুরুতে গেম, শেষে প্রেম।' স্নেহ মানুষকে অন্ধ করে দেয়। আগে পিছে কেউ ভাবেন না। পরিণতি যখন হাতের বাইরে চলে যায়, তখনই টনক নড়ে সবার।

আগে শিশুদের খাওয়াতে প্রায় সব বাড়িতেই কার্টুন খুলে দেওয়া হতো। এখনও হয়। অভ্যেসটা ভালো নয়। ঠিক তেমনই ছোটোদের হাতে মোবাইল খুলে গেম খেলতে দেওয়া হয়, যা আরও বড়ো ভুল। এই শুরুটাই পরবর্তীতে একটি শিশুর কাছে 'অভ্যাস' হয়ে দাঁড়ায়। এমনিতেই স্কুলে পড়াশোনার চাপ-সহ পারিপার্শ্বিক নানা ঘটনায় যথেষ্ট 'স্ট্রেস' শিশুমনকে প্রভাবিত করে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি, তা পরে মনের অসুখে রূপান্তরিত হয়েছে।' ডাঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের এমন নানা কেসহিস্ট্রির অভিজ্ঞতায় শিশুরাও বাদ যায় না।

এই প্রসঙ্গে কয়েকদিন আগেকার একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। তেইশ বছরের যুবতী রিমঝিম (নাম পরিবর্তিত)। একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বেশ সুনামের সঙ্গে চাকরি করছিল সে। ফেসবুকে পরিচয় হয় বর্ধমানের এক যুবকের সঙ্গে। পরে ঘনিষ্ঠতা। এই বিয়েতে আপত্তি তুলেছিল রিমঝিমের পরিবার। কারও কোনো আপত্তি ধোপে টিকল না। বিয়েও হলো। কিন্তু সংসার আর করা হলো না রিমঝিমের। প্রতারক যুবকটি সোনাদানা, টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল বিয়ের এক মাসের মধ্যেই। পরিণতিতে গভীর হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল সে। আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিল। কঠিন লড়াই সামলে আপাতত রিমঝিম মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

আসলে যাদের আবেগ বেশি, কম সময়ের মধ্যেই তারা যে-কোনো বিষয়ে চট করে জড়িয়ে পড়ে। মনের মধ্যে জটিলতা থাকে না বলে ওই একই জিনিস নিয়ে চর্চা করতে থাকে। সেই চর্চার পাশাপাশি চলে আসে ব্যর্থতা। একাকিত্ব ধীরে ধীরে মনকে গ্রাস করে নেয়।' বলছিলেন ডাঃ মুখোপাধায়।

চিকিৎসা বিজ্ঞান দ্রুত এগোচ্ছে। সমস্যার সমাধানে, প্রতিকারের নানা পথও আছে। একাকিত্ব, ডিপ্রেশনের শুরুতেই দেখা হয়, অসুখের শিকড় কত গভীরে। যে ধরনের গান শুনতে ভালো লাগে, সেই গান বারবার শোনা বা অচেনা পরিবেশে ঘুরে আসা খুবই জরুরি। মন শান্ত হয়। তিক্ততা অনেকটাই কেটে যায়। যে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গ ভালো লাগে বা যে সব আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মিশলে মনের কষ্ট অনেকটাই প্রশমিত হয়, তাদের উপস্থিতি এই মুহূর্তে খুবই জরুরি। সব সময় ওষুধ খেতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ◻

‘ভারতবর্ষে নারী নির্যাতনে শীর্ষে যোগী রাজ্য’— বাস্তব নাকি মিডিয়া অপপ্রচার?

ড. প্রসেনজিৎ ঘোষ

‘ভারতবর্ষে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে শীর্ষে যোগী রাজ্য’, ‘ফের ধর্ষণ যোগী রাজ্যে’, ‘দলিত মহিলাকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে হত্যা যোগী রাজ্যে’— এই জাতীয় সংবাদের হেডলাইন বিভিন্ন মিডিয়া হাউস এবং রাজনৈতিক পক্ষের বাঁধা লব্জ, যা বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনেও বহুলভাবে প্রচারিত হয়েছে। বিভিন্ন অবিজেপি রাজনৈতিক দল বা বিজেপি বিরোধী শিবিরের পক্ষ থেকে বহুদিন ধরে লাগাতার এই প্রচার চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে যে বিজেপি নামক দলটি একটি আপাদমস্তক পুরুষতান্ত্রিক দল যাদের হাতে ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের মা-বোনেদের সম্ভ্রম আদৌ সুরক্ষিত নয়। বিভিন্ন মহল থেকে লাগাতার এরকম প্রচারও চালানো হচ্ছে যে বিজেপি ক্ষমতায় এলেই পশ্চিমবঙ্গের নারীদের সম্ভ্রম ভূলুণ্ঠনের উৎসব পালিত হবে রাজ্যের কোণায় কোণায়। এক্ষেত্রে অবধারিতভাবে সবসময়েই টেনে আনা হয় উত্তরপ্রদেশের নারী নির্যাতনের বিভিন্ন চিত্র। ব্যক্তিগত পরিসরে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতাতেও দেখেছি একাধিক শিক্ষিত বাঙ্গালি আমার কাছে একই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বা সোশ্যাল মিডিয়াতেও বিভিন্ন পেজ, প্রোফাইল এবং তাদের কমেন্ট সেকশনেও অনেককেই এই জাতীয় আশঙ্কা প্রকাশ করতে দেখা গেছে। কিন্তু প্রচার সর্বস্ব এই সোশ্যাল ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার ইনফর্মেশন ম্যানিপুলেশনের যুগে একজন পরিসংখ্যানবিদ বা রাশিবিজ্ঞানী হিসেবে আমার মধ্যে বহুদিন ধরেই বিভিন্ন কারণে এসব বক্তব্যের বাস্তবতা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন জেগেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নারীদের প্রতি সংগঠিত অপরাধ ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেই কম বেশি ঘটে থাকে এবং এমন নয় যে এটি ভারতবর্ষের একটি নির্দিষ্ট রাজ্য বা অংশেই শুধু সীমাবদ্ধ। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে বিগত কয়েক বছর যাবৎ প্রায়

প্রতিটি বিজেপি বিরোধী মিডিয়া হাউসের সংবাদ পরিবেশনের ধরন দেখলে একজন সাধারণ মানুষের মনে হতেই পারে যে একমাত্র যোগী আদিত্যনাথের আমলে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যটিতেই নারীরা ভীষণভাবে নির্যাতিতা এবং ভারতবর্ষের বাদবাকি অন্যান্য অংশে তারা ভীষণ সুরক্ষিত। সংশয়ের কারণ আরও বেড়ে যায় যখন দেখি হাথরাস, উন্নাও ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গার ঘটনা যতটা ফলাও করে দিনের পর দিন একপাক্ষিক ভাবে বিভিন্ন মিডিয়ার ফ্রন্টলাইনে জায়গা করে নেয়, অথচ অন্যান্য রাজ্যে এই একই ধরনের নারকীয় ঘটনা ঘটলে সেগুলো এই মিডিয়া হাউসগুলোর কাছে উপেক্ষিতই থেকে যায়। হয় সেগুলো রিপোর্টেড হয় না, নয়তো তাদের জায়গা হয় শেষের দিকের পাতার একটি কোণায় বা কলামে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ সরকারপন্থী প্রথম শ্রেণীর মিডিয়া হাথরাসের দলিত মহিলার ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে যতখানি মুখরিত, তারাই বিগত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক অনগ্রসর শ্রেণীর নারীদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ, যা স্পষ্টতই এক ধরনের দ্বিচারিতা যা দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট।

লক্ষণীয় এই যে এই জাতীয় সংবাদমাধ্যমের হেডলাইনে বারংবার একটি শব্দবন্ধ ‘যোগী রাজ্য’ কথাটি জায়গা করে নেয়। খুব সহজেই সেখানে ‘যোগী রাজ্য’ শব্দবন্ধটি বাদ দিয়ে অন্যান্য রাজ্যগুলির মতো উত্তরপ্রদেশ নামটি ব্যবহার করা যেত এবং সহজবুদ্ধিতে এটাই হওয়া উচিত। কারণ, একটি রাজ্যের নামকে আমরা সেই রাজ্যটির ভৌগোলিক সীমানা দিয়েই চিনি, তার মুখ্যমন্ত্রীর পরিচয়ে নয়। একজন মুখ্যমন্ত্রী আসবেন, যাবেন, কিন্তু রাজ্যের পরিচয় অক্ষুণ্ণ থাকবে। স্বভাবতই এই ধরনের পক্ষপাতদুষ্ট হেডলাইনের মধ্য দিয়ে সংবাদ পরিবেশন মনের মধ্যে এই সন্দেহই উদ্রেক করে যে এই জাতীয় দাবির মধ্যে সত্যতা কতটুকু? নাকি সেটা ‘প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা’র মতোই আরও একটি পলিটিক্যাল প্রোপাগান্ডা? এই প্রসঙ্গে বামপন্থীদের কোনও একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জনগণের মনে ক্রমাগত হ্যামারিং করার মধ্য দিয়ে প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর বিশেষ কায়দাটি স্মর্তব্য। মনে করুন গোয়েবেলসের সেই বিখ্যাত নীতি : ‘একটি মিথ্যা কথা ক্রমাগত প্রচার করে যেতে থাকলে একসময়ে সেটিই সত্যিতে পরিণত হয়’। ফলে এই বারংবার ‘যোগী রাজ্য’ কথাটির সর্বত্র একই কায়দায় ব্যবহার হতে দেখে বিজ্ঞানের একজন ছাত্র হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই মনে ওই বক্তব্যের সত্যতা নিয়ে সন্দেহের উদ্রেক হয়। এও প্রশ্ন জাগে যে নির্দিষ্ট একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নামের বারংবার ব্যবহার কি জনমানসে তার সম্পর্কে একটা নেতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার অপকৌশল নয়? তাহলে আসুন, সমস্তরকম রাজনৈতিক অভিসন্ধি সরিয়ে রেখে পরখ করে দেখা নেওয়া যাক এই বিষয়ে প্রকৃত তথ্য কী বলছে?

প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে ভারতবর্ষে অপরাধ সংক্রান্ত যে কোনও রকম তথ্য পেতে চাইলে এখনও অব্দি National Crime

Records Bureau সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্র। স্বভাবতই এনসিআরবি ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আজকে 'ভারতবর্ষে নারী নির্যাতনে শীর্ষে যোগী রাজ্য' এই দাবির সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা করা যাক। প্রথমেই উল্লেখ্য যে এই বিষয়ে বিজেপি বিরোধী শিবিরগুলোর দাবির অন্যতম বড়ো হাতিয়ার হচ্ছে ভারতবর্ষে নারী নির্যাতনে মোট সংখ্যার নিরিখে উত্তরপ্রদেশের শীর্ষস্থানে থাকা। কিন্তু সে শুধু আজকের কথা নয়, বহু বছর ধরেই উত্তরপ্রদেশ নারী নির্যাতনের মোট সংখ্যার নিরিখে ভারতবর্ষের প্রথম তিনটি রাজ্যের অন্যতম। কিন্তু এক্ষেত্রে মোট অপরাধের সংখ্যা রাশিবিজ্ঞানের পরিভাষায় বিচার্য হওয়া উচিত নয়। কেন নয়, এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা দরকার।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় যে এনসিআরবি-র ওয়েবসাইটে বিভিন্ন বছরে নারী নির্যাতন সম্পর্কিত অপরাধের যে রিপোর্ট পাওয়া যায়, সেখানে মোট অপরাধের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি লক্ষ নারীদের মধ্যে অপরাধের হারও নির্ণয় করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রতিটি রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নারীদের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে প্রতি লক্ষ নারীর মধ্যে অপরাধের হারকে সংজ্ঞায়িত করা হয়ে থাকে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে অপরাধের সংখ্যা সেই অঞ্চলের জনসংখ্যার সঙ্গে সমানুপাতিক। ফলে ভিন্ন ভিন্ন আয়তন ও জনসংখ্যা বিশিষ্ট বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ের তুল্যমূল্য আলোচনা করতে হলে অতি অবশ্যই অপরাধের সংখ্যাকে একটি common base system-এ নিয়ে আসা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, উত্তরপ্রদেশ ভারতবর্ষের চতুর্থ বৃহত্তম এবং সর্বাধিক জনবহুল রাজ্য। ২০১৯ সালের হিসেব অনুযায়ী এই রাজ্যের ইস্টিমেটেড জনসংখ্যা প্রায় কুড়ি কোটির কাছাকাছি এবং নারী সংখ্যা প্রায় ১০ কোটির কাছাকাছি। অপরপক্ষে আয়তন এবং জনসংখ্যার নিরিখে মণিপুর রাজ্যটি দুটি ক্ষেত্রেই গোটা দেশে ২৩তম স্থান অধিকার করে। ফলে নারীদের ক্ষেত্রে সংগঠিত অপরাধের ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশ এবং মণিপুরের মোট অপরাধের সংখ্যার তুল্যমূল্য বিচার করা Statistics-এর পরিভাষায় একটি unfair বা inappropriate comparison হিসেবে গণ্য করাই শুধু নয়, এটি একটি অনৈতিক কাজও বটে। কারণ, বিপুল জনসংখ্যার উত্তরপ্রদেশে খুব স্বাভাবিকভাবেই অপরাধের সংখ্যা বেশি হবে। আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এখানে কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হলো। প্রথমেই উল্লেখ্য অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা রাজ্য দুটির কথা। আমরা জানি যে ২০১৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যটিকে ভেঙে অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা দুটি পৃথক রাজ্য গঠিত হয়। অতএব ২০১৩ বা তার পূর্ববর্তী সময়ের অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশে অপরাধের মোট সংখ্যা তার পরবর্তী সময়ের অন্ধ্রপ্রদেশে অপরাধের মোট সংখ্যা অপেক্ষা যে বেশি হবে, সেটাই প্রত্যাশিত। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে অন্ধ্রপ্রদেশে অপরাধের হার তুলনা করতে হলে, একমাত্র প্রতি লক্ষ বা প্রতি মিলিয়ন জনসংখ্যার মানদণ্ডেই বিচার্য, মোট সংখ্যার ভিত্তিতে নয়। তথ্য বলছে ২০১২ ও ২০১৩ সালে অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশে নারী নির্যাতনের সংখ্যা যথাক্রমে ২৮,১৭১ এবং ৩২,৮০৯। অপরপক্ষে ২০১৪ ও ২০১৫ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে এই সংখ্যা যথাক্রমে ১৬,৫১২ এবং ১৫,৯৩১। ফলে, এই বিভিন্ন বছরের অপরাধের হারের তুল্যমূল্য বিচার করতে হলে প্রতি লক্ষ বা প্রতি মিলিয়ন হারকেই গণ্য করা দরকার।

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা বলা খুব জরুরি। এই সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক বাম মনোভাবাপন্ন মানুষজন অনেক সময়ই বিভিন্ন রাজ্যের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি এবং আন্ডার রিপোর্টিংয়ের দাবি তুলে থাকেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার আন্ডাররিপোর্টিংয়ের বিষয়টি। দেখুন, বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন সোশ্যাল ইস্যুতে আন্ডাররিপোর্টিং যে ঘটতে পারে, সেটা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেটার কোনও যথাযথ Statistical measure কি দেওয়া সম্ভব? এমন কোনো পদ্ধতি এখনও চোখে পড়েনি যা দিয়ে এই আন্ডাররিপোর্টিংয়ের quantification নিরূপণ করা সম্ভব। এমনকী তারাও সেই বিষয়ে বিন্দুমাত্র আলোকপাত করতে সক্ষম হন না। ফলত, যে তথ্য আমাদের হাতে রয়েছে, শুধুমাত্র তার ভিত্তিতেই বিশ্লেষণ সম্ভব। যে তথ্য measure করা সম্ভব নয়, তার ভিত্তিতে কোনও গঠনমূলক আলোচনা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, এটা অনস্বীকার্য যে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে নারী নির্যাতনের পরিস্থিতি ভিন্ন। তা বহুলাংশে নির্ভর করে সেখানকার আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি, social norms এবং স্থানীয় প্রশাসনের ওপরে। অর্থাৎ প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পপুলেশন non-homogeneous। এবং non-homogeneous পপুলেশনের ক্ষেত্রে তাদের absolute নম্বরের তুলনা করা শুধু Statistically inappropriate-ই শুধু নয়, এক প্রকারের মূর্খামিও বটে। ফলত, এখানে অপরাধের হারকে একটি common scale-এর নিরিখে নির্ণয় করা খুবই জরুরি। অথচ ওই ব্যক্তিরা চান, উত্তরপ্রদেশের সর্বোচ্চ সংখ্যাকে মান্যতা দিতে। অপরপক্ষে তাদের এই দাবিকে মান্যতা দিলে একই সঙ্গে তাদের এটাও স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে মোট সংখ্যার বিচারে ২০১২ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে নারী নির্যাতনের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ গোটা দেশের নিরিখে যথাক্রমে প্রথম, তৃতীয়, দ্বিতীয়, দ্বিতীয়, দ্বিতীয়, তৃতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান দখল করে। স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের নিজেদের রাজ্যে নারী সুরক্ষার বিষয়টি একবার ভেবে দেখতে অনুরোধ জানাই। কখনো দেখেছেন এই বিষয়কে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নামোল্লেখ করে কোনও দলদাস মিডিয়া হাউস কোনও রিপোর্টিং করেছে? দেখতে পাবেন না। কারণ, আজকের মেরুদণ্ডহীন বঙ্গ মিডিয়ার একটা বড়ো অংশই এখন ভাবের ঘরে চুরি করতে অভ্যস্ত। তাছাড়া কীসের ভিত্তিতে আমরা দাবি করতে পারি যে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরপ্রদেশের আন্ডাররিপোর্টিংয়ের হার ভিন্ন? এক্ষেত্রে পুরোটাই একটা presumption, নয় কি? অনেকে এরকমও দাবি করে থাকেন যে অপরাধের হারের সঙ্গে একই সময়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জিএসডিপি বা জিএসডিপি পার ক্যাপিটা, এইচডিআই (হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স), পিপিআই (পারচেসিং পাওয়ার ইনডেক্স) ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক প্যারামিটারস-কেও আলোচনার আওতায় আনা হোক। তাদের উদ্দেশ্যে এটাই বলার যে বাস্তববুদ্ধি দিয়ে যা বুঝছি, অপরাধের হারের সঙ্গে এই বিবিধ measure বা parameter-গুলির correlation খুব সম্ভবত পাওয়া যাবে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এক্ষেত্রে causal relationship রয়েছে বলা যায় না। কারণ, correlation doesn't imply causation এবং এই জাতীয় observational study দিয়ে causal relationship establish করা সম্ভবপর নয়। এই প্রসঙ্গের শেষে এটাই বলার যে এই প্রতি লক্ষে অপরাধের হার নির্ণয় করা শুধুমাত্র ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী সরকারের আমল থেকে চালু হয়নি। বরঞ্চ, তার বহু আগে থেকেই এই

নারীদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধের হারের নিরিখে 'যোগী রাজ্য' উত্তরপ্রদেশ বা অধিকাংশ বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির তুলনায় বিভিন্ন অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির অবস্থা আরও করুণ এবং তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। ফলে বিজেপি শাসিত রাজ্য মানেই নারী সুরক্ষা প্রশ্নের মুখে এই জাতীয় দাবি কি আদৌ ধোপে টেকে? এনসিআরবি তথ্য কিন্তু সেই দাবিকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দেয়। ফলে শুধুমাত্র উত্তরপ্রদেশকে টার্গেট করে যোগী আদিত্যনাথের নাম বরংবার নারী নির্যাতনের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে

সংবাদ পরিবেশনের যে ট্রেন্ড আমরা দেখছি বিগত কয়েক বছর ধরে, সেটিকে একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা ব্যতীত অপর কিছুই মনে হয় না।

পদ্ধতি এনসিআইবি ডাটায় বিদ্যমান। খুব সঙ্গত কারণেই বিভিন্ন রাজ্যে অপরাধের হারের তুলনামূলক আলোচনায় এটিই একমাত্র মাপকাঠি হওয়া সম্ভব, যেটা ইতিমধ্যেই বিশদে আলোচিত হয়েছে। এতো কথার অবতারণা এই কারণেই জরুরি যাতে পাঠকদের কাছে অপরাধের হার নির্ণয়ের এই মাপকাঠিটি সম্পর্কে সঠিক ধারণা পৌঁছে দেওয়া যায়।

এবারে আসি মূল প্রসঙ্গে। আসুন, দেখে নেওয়া যাক অপরাধের হার কী কথা বলছে। তথ্য বলছে, নারীদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধের হারের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ২০১২ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে যথাক্রমে তৃতীয়, অষ্টম, পঞ্চম, নবম, সপ্তম, নবম, অষ্টম ও নবম। এবং এই পুরো সময় জুড়ে পশ্চিমবঙ্গের হার জাতীয় হারের থেকে সাধারণভাবে যথেষ্ট বেশি। অপরপক্ষে, উত্তরপ্রদেশে বিজেপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে ২০১৭-২০১৯ সালে উত্তরপ্রদেশের এই র‍্যাঙ্কগুলি যথাক্রমে ১৫, ১৩ ও ১২। এবং উত্তরপ্রদেশে এই অপরধের হার এই তিনটি ক্ষেত্রেই জাতীয় গড়ের তুলনায় কম। আরও উল্লেখ্য যে ২০১২-১০১৮ অব্দি উত্তরপ্রদেশে এই হার ঊর্ধ্বমুখী হলেও, ২০১৯ সালে এই হার নিম্নমুখী (তথ্য অনুযায়ী)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিন্তু ২০১৮-র পরে এনসিআরবি-র কাছে আর কোনো তথ্য পাঠায়নি। ফলে, ২০১৯ সালের জন্য হাতের কাছে প্রাপ্ত যে পরিসংখ্যান রয়েছে, তাই দিয়েই এই বিশ্লেষণ করতে হয়েছে। সেটি হলো, বিভিন্ন বিজেপি বা এনডিএ শাসিত রাজ্য যেমন উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, বিহার, ঝাড়খণ্ড, গুজরাট, ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, উত্তরাখণ্ড, হিমাচলপ্রদেশে এই অপরাধের হার কিন্তু জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশ কম। এক্ষেত্রে সেই রাজ্যগুলিতে বিজেপি কোন বছরে ক্ষমতায় এসেছিল, সেটা অবশ্যই লক্ষণীয়। আরও লক্ষণীয় যে বামেদের গর্বের কেরল এবং একদা গর্বের ত্রিপুরায় তাদের শাসনকালে নারী সুরক্ষার করুণ চিত্র। বামশাসিত রাজ্য কেরলের পরিস্থিতি এই বিষয়ে উত্তরপ্রদেশের তুলনায় বেশ খারাপ এবং মাত্র দুটি বছর ব্যতীত বাকি পুরো সময়টাই সেখানকার হার জাতীয় গড় অপেক্ষা বেশি। আরও লক্ষ্য করে দেখুন, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে আর কখনোই কিন্তু ত্রিপুরায় নারী সুরক্ষর অবস্থা এমন করুণ হয়নি, বরং যথেষ্ট উন্নতি করেছে। অস্বীকার করা যাবে না যে এই সময়ের মধ্যে (২০১২-১০১৯) শুধুমাত্র দুটি বিজেপি শাসিত রাজ্য যেমন হরিয়ানা ও মধ্যপ্রদেশ নিয়মিত প্রথম দশেই রয়েছে এবং এদের প্রত্যেকের পরিসংখ্যান জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশি। অথচ একই সময়ে রাজস্থান, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, পশ্চিমবঙ্গ, কেরলের মতো অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিও কিন্তু নিয়মিত প্রথম দশের মধ্যে বিদ্যমান। আরও লক্ষ্যণীয় যে ২০১৮-১৯ সালে যখন বিজেপি মহারাষ্ট্রে ক্ষমতায় ছিল, শুধুমাত্র সেই দুটি বছরে মহারাষ্ট্রের হার জাতীয় হারের থেকে বেশি, কিন্তু অন্য সময়গুলিতে নয়। এই প্রসঙ্গে অসমের কথা আলাদা করে আলেচনার দাবি রাখে। মনে রাখা দরকার যে অসমে বিজেপি ক্ষমতায় আসে ২০১৭ সালে এবং তারও আগে একটা দীর্ঘ সময় ধরে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সরকার সেখানে একটা বড়ো সময় ধরে শাসন করেছে। এনসিআরবি তথ্য বলছে যে অসমে নারী নির্যাতনের হার বহু বছর ধরেই দেশে প্রধান দুটি স্থানের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। ফলে, শেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বিজেপির শাসনকালে অসমের প্রথম স্থানে থাকা আদৌ কি কোনো বিস্ময়ের উদ্রেক করে? খুব সম্ভবত উত্তরটি হওয়া উচিত, না। এই বিশ্লেষণের শেষে যে রাজ্যটির কথা না উল্লেখ করলেই নয়, সেটি হলো গুজরাট। লক্ষ্য করে দেখুন যে, নারী নির্যাতনের নিরিখে গুজরাট কিন্তু বরাবরই নীচের দিকের রাজ্যগুলির অন্যতম। তথ্য বলছে গুজরাটে এই অপরাধের প্রবণতার হার ক্রমশ নিম্নমুখী এবং বর্তমানে তা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় stabilize করে গেছে। অথচ এই গুজরাট সম্পর্কেই আমাদের রাজ্যের বিজেপি বিরোধী শিবির থেকে নিয়মিত প্রচার করা হয় 'বাংলাকে গুজরাট হতে দেবো না'। নারী নির্যাতনের প্রশ্নে এই দাবিটি হাস্যকর মনে হয়, নয় কি?

(লেখক পিএইচডি ইন স্ট্যাটিসটিক্স, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট। বর্তমানে টেক্সাস এ অ্যান্ড এম ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং অ্যাসিস্টান্ট প্রফেসর হিসেবে কর্মরত)

প্রাচীন হিন্দু সমাজে লিঙ্গবৈষম্য ছিল না

দেববানী হালদার

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাড়ির মেয়েরা উপার্জনের জন্য বাইরে বেরিয়ে আসে। বিশ্বজুড়ে যে অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয়, তার থেকে মুক্তি পেতে পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নারীও সংসারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। আমেরিকা বা ইউরোপে নারীস্বাধীনতা বলতে সেই অর্থে কিছু ছিল না। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার জন্য, ভোটাধিকার অর্জন করার জন্য, কলকারখানায় কাজ করার জন্য রীতিমতো লড়তে হয়েছে। মধ্যযুগের অন্ধকার সময়ে ইউরোপে চার্চের বিরোধিতা করলেই ডাইনি বলে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। কেউ প্রেম করলে তার শাস্তিও আগুনে পুড়িয়ে মৃত্যু। কাজেই এদের লড়াই করতে হয়েছে অসাম্যের বিরুদ্ধে, সমানাধিকার আদায়ের জন্য। নারীবাদ তাই পুরুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে প্রতিবাদ করার এক উপায়ের নাম।

আবার মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা ছিল আরও ভয়াবহ। নারী শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র। কিন্তু সেই যন্ত্র বা মানুষ উৎপাদনের কারখানার সম্মান তারা করেনি। মানুষ হিসেবে সম্মান তো বহু দূরের কথা, ন্যূনতম অধিকার পর্যন্ত পায়নি সেখানকার নারীরা। পুরুষের মনোরঞ্জনকারিণী, পুরুষের বশীভূত, পুরুষের ইচ্ছাধীন মূক, বধির একটি সম্প্রদায় যারা নিজের মুখ দেখাবে কিনা তার জন্যেও অনুমতি লাগে। নারী সন্তান ধারণ করবে কিনা এই অধিকার অর্থাৎ তার নিজের শরীরের অধিকার থেকেও সে বঞ্চিত। এক পুরুষের অনেক স্ত্রী যারা শুধু সন্তানের জোগান দিয়ে যাবে, বিনিময়ে জুটবে হাজার অত্যাচার, বৈষম্য। এদের মুক্তি আজও মেলেনি। কোনো নারীবাদী এদের অধিকার রক্ষায় মাইক ধরে গিমিকের ফানুস ওড়ায়নি কখনো।

এবার দেখা যাক ভারতের অবস্থান। বর্তমান সময়ে বাসের সিট, মেট্রোয় সিট, গণতন্ত্রে রিজার্ভ সিট নাকি নারীবাদের প্রতীক। এদিকে কঠোর ধর্ষণের সাজা মকুবের জন্য এইসব নারীবাদীরাই সবার আগে সোচ্চার। যারা মন্দিরের গর্ভগৃহে যাবার জন্য আন্দোলন করে, তারা মসজিদে নামাজ পড়ার সময় নিটোল নীরব। যারা মেয়েদের পিরিয়ডস-এর সময় নানা নিয়ম নিয়ে এত চিন্তিত, তারাই আবার অন্য সমাজে নিকাহ হালালার বিরুদ্ধে চুপ। এক পুরুষ যেখানে দুই নারীর সঙ্গে সমান, সেখানে নারীর সমান অধিকারের কথা কেউ বলেনি। আশ্চর্যজনক!

এদিকে বারবার বলা হয় যে ভারতে নাকি নারীদের সমান অধিকার নেই, বৈষম্য নাকি সমাজের প্রতি স্তরে। নারীবাদীরা সারাক্ষণ ঘণ্টা বাজিয়ে হিন্দু ধর্মকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে। আমাদের প্রাচীন সমাজে নারীদের অবস্থান কী ছিল, নারীদের অধিকার কতটা সুনিশ্চিত ছিল, নারী কতটা সুরক্ষিত ছিল, একটু দেখে নিই।

নারী কতটা সুরক্ষিত ছিল বোঝা যাবে সেই সমাজে নারী নির্যাতনের প্রকৃতি দেখে, নারীর যৌন স্বাধীনতা ছিল কিনা সেটা দেখে। গৃহস্থ জীবনে সে অত্যাচারিত কিনা, তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল কিনা তার মূল্যায়ন করে। বৈদিক যুগ থেকে মোটামুটি লিখিত যা প্রমাণাদি আছে, তাতে অনেক শ্লোকের রচয়িতা নারী। নারী সেই সময় নিজে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করবে নাকি পঠনপাঠনে জীবন নিমজ্জিত করবে, সেই সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার তার ছিল। তাই ব্রহ্মচারিণী নারীর অভাব ছিল না। আবার বেদ পঠন করে সংসার করবে কিনা, সেই সিদ্ধান্ত নেবারও অধিকার ছিল। সমাজে নারীর সম্মান না থাকলে কখনোই কোনো নারী আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে এত বড়ো সিদ্ধান্ত নিতে পারত না।

ভারতকে প্রথম যিনি রাজনৈতিক ভারতবর্ষের রূপ দেন তিনি সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।

এই মৌর্য বংশের নাম এসেছিল সম্ভবত চন্দ্রগুপ্তের শূদ্র মা মুরার নামে। চন্দ্রগুপ্তের পিতৃ পরিচয় পাওয়া যায় না, একটি মত বিশ্বাস করে মহাপদ্মনন্দের অবৈধ সন্তান। মুরার ছেলে থেকে মুরাইয়া থেকে মৌরিয়া, হিন্দি উচ্চারণ অনুযায়ী। অর্থাৎ ভারতের প্রথম শক্তিশালী রাজবংশের নামকরণ স্বামীহীন বা পুরুষহীন এক শূদ্র নারীর থেকে হয়েছে। এটাকে যদি নারীবাদের জয় না বলি তবে নারীবাদ কাকে বলে? পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যেখানে এখনও পিতৃ পরিচয়হীন সন্তানের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, সেখানে আড়াই হাজার বছর আগে তার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা হলো।

চাণক্যর অর্থশাস্ত্র তৎকালীন নারীদের অধিকার, তাদের ভূমিকা, তাদের কর্মজীবন খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছে। নারীকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। একদল গৃহে থেকে উপার্জনহীন, আরেক দল উপার্জন ক্ষমতা সম্পন্ন। সেই সময় যুদ্ধ ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজ। যুদ্ধের উপর সমগ্র সমাজের ব্যবস্থা নির্ভরশীল ছিল। তাই দক্ষ সৈনিকের প্রয়োজন ছিল সব জায়গায়। পুরুষ তার স্বাভাবিক ক্ষমতা বলে সৈনিক হতো। তাই পুত্র সন্তানের প্রতি সমাজের মোহ, দুর্বলতা বা এক প্রকারের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ছিল। কী মনে হচ্ছে, এই পর্যন্ত পড়ে, তবে মরু সংস্কৃতির জরায়ু দখলের আমি বিরোধিতা করেছি কেন? সমাজে পুরুষের দরকার ছিল। কিন্তু তার জন্য নারীর জন্য ছিল আলাদা সুরক্ষা, আলাদা মর্যাদা। সে স্বাধীন ছিল নিজের সঙ্গী নির্বাচন করায়, বাধা দেওয়ার অধিকার পরিবারের ছিল না। যে কোনো বর্ণের পুরুষ নির্বাচন করার অধিকার ছিল। পুত্র ও কন্যার সম্পত্তির উপর সমান অধিকার থাকত। কন্যা ও পুত্রের শিক্ষা ও মর্যাদার যেমন সমতা ছিল, সেইরকমই ব্যবসা বাণিজ্য, অস্ত্র শিক্ষা এবং প্রয়োজনে রাজ্য শাসনের অধিকার পর্যন্ত নারীর ছিল, যা সারা বিশ্বে কোথাও ছিল না। বিধবা হলে তার বিবাহের কথা বলা হয়েছে। কোনো পুরুষ যদি দীর্ঘদিনের জন্য প্রবাসে গিয়ে না ফিরত, তবে তার স্ত্রী অন্য পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারত। এটা কি যুগান্তকারী চিন্তা নয়? পরিত্যক্ত ছিল না কেউ। নারীর শারীরিক বা মানসিক জোর ছিল না নারী সম্মতি ছাড়া কোনো ভাবে তার সঙ্গে সম্পর্ক করা সম্ভব ছিল না। যে কোনো নারী ও পুরুষ তাদের সম্পর্কের দায়িত্ব থেকে পালাতে পারত না। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট নিয়ম করে তাকে সুরক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সন্তানের জন্মের পর কোনো গৃহস্থ স্ত্রীর অধিকার ছিল সে সংসার করবে কী করবে না, সেই সিদ্ধান্ত নেবার। অর্থাৎ গৃহবধূ হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করতে পারলে সে সংসার ত্যাগের অধিকার পাচ্ছে। নিঃসন্দেহে চোখ কপালে উঠে যায়। আজকের দিনেও কি এই উদারতা আমরা পেয়েছি? সেই সময় রাষ্ট্র সমর্থিত গণিকা ব্যবস্থা ছিল। কাজেই পুরুষ গণিকালয়ে যেত। কিন্তু তাই বলে সে তার স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব ও দাম্পত্য জীবন বিচ্ছিন্ন করতে পারত না। কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে যেমন দাম্পত্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারত না, ঠিক তেমনি একজন পুরুষও

সেটা করতে পারত না। উপরন্তু যেহেতু তার জন্য গণিকার মতো বিকল্প ব্যবস্থা ছিল, তাই শাস্তিও দ্বিগুণ ছিল। আজ যারা অন্য নারী সঙ্গ করে, তাদের স্ত্রীদের যৌন আকাঙ্ক্ষার কথা সমাজ ভেবেছে কখনো? কেউ একটা শব্দ খরচ করেছে কখনো? কোনোদিনও না। একাকী নারীর সামাজিক উপশম, তার প্রতি সমাজের দায়িত্ব, তা সে সামাজিক হোক বা তার যৌন চাহিদা, স্বীকৃতি মেলেনি এখনও।

সেই সময় ধর্ষণ ছিল না। ধর্ষণ বা বলপূর্বক যৌন মিলন কোনোটাই ছিল না, এই ধারণা এসেছে মরু সংস্কৃতি থেকে। তার আগে কোনোরকম নির্যাতনের বিনিময়ে ছিল কঠিন শাস্তি। এমনকী ক্রীতদাসকেও যৌন অত্যাচার করা যেত না। গণিকাদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য ছিল। কারা যেন বলে, ছোটো পোশাক দেখে, খোলামেলা শরীর দেখে তাদের ধর্ষণের ইচ্ছা জেগে ওঠে? যে সমাজে একজন গণিকাকে তার অনুমতি ছাড়া ভোগ করা যেত না, সেই সমাজ কী নারীস্বাধীনতার সমর্থক বা দৃষ্টান্ত নয়? কেউ নির্যাতিত হয়ে মারা গেলে, আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। আজও এই যুগে ধর্ষণের বিচারের নামে প্রহসন হয়, ফাঁসির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, তারাই আবার নারীবাদের ডঙ্কা বাজায়।

অন্য অঞ্চল দখল করে ক্রীতদাস প্রথা

ফঃ ৪

প্রাচীন পৃথিবীর সর্বত্র ছিল। কিন্তু ইউরোপ বা মধ্য প্রাচ্যে ছিল যৌন অত্যাচার, মারাত্মক যৌন নির্যাতন। ভারতীয় সভ্যতা সেখানে নারীদের যথেষ্ট সুরক্ষা ও সম্মান দিয়েছিল। শহরের সুরক্ষা কর্মীরা তাদের হেনস্থা করলে শাস্তি পেতে হতো। যেখানে ক্রীতদাস কাজ করত সেখানে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌন সংসর্গ করলে কঠোর শাস্তি হতো। ভ্রূণহত্যা অসম্ভব ছিল। কঠোর শাস্তি প্রদান করা হতো। কোনো ক্রীতদাসী স্বেচ্ছায় তার প্রভুর সন্তান গর্ভে ধারণ করলে, মা ও সন্তানের মুক্তি মিলত। সেই মা ও সন্তান সম্পূর্ণরূপে সমাজের অঙ্গ হিসেবেই স্বীকৃতি পেত। অর্থাৎ অন্য দেশ থেকে আসা পরাজিত একটি নারী তার বিজেতাকে একটি সন্তান দিয়ে নিজের মুক্তি ক্রয় করছে। এর সামাজিক প্রেক্ষাপট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরাজিত নারীকেও অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচিয়ে তারা দ্বারা একটি নাগরিক সংখ্যা বৃদ্ধির সুকৌশল, অসাধারণ সমাজ ব্যবস্থার প্রদর্শন করে।

স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে স্ত্রী হয় বিবাহ করতে পারত অথবা নিয়োগ প্রথা মেনে সন্তানের জন্ম দিতে পারত। ক্ষেত্রজ সন্তানের জন্য কোনো বৈষম্য ছিল না। থাকলে মহামন্ত্রী বিদুর সেই সময়ের অন্যতম বিদ্বান হিসেবে গণ্য হতেন না। বিচিত্রবীর্যের স্ত্রীদের জন্য যাকে নিয়োগ করা হয়েছিল সেই ব্যাসদেব বিচিত্রবীর্যের সৎভাই। পিতা আলাদা, মা এক। সেই ব্যাসদেব কর্তৃক নিয়োগ হলো এক দাসীর। অথচ সেই সন্তান কৌরববংশের সম্মান পেল। এক ঐতিহাসিক ঘটনা। অন্য কোনো দেশ বা সভ্যতায় এইরূপ উদারতা ছিল কী, জানা নেই।

এবার আসি রূপজীবী গণিকাদের কথায়। এরা এই পেশায় স্বেচ্ছায় আসত। এদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল বলে শাসন ব্যবস্থায় প্রভূত ক্ষমতা ছিল। এক ষষ্ঠাংশ কর দিতে হতো এদের। এরা অভিজাত হিসেবে পরিগণিত হতো। এদের সম্পত্তি আবার পুত্ররা পেত না। বোন বা মেয়েরা পেত। অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ভিতর মাতৃতান্ত্রিক সমাজের ব্যবস্থা ছিল, যাতে এদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে। রাষ্ট্রকে কর দিচ্ছে বলে এদের জন্য রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা ছিল। রাজার রক্ষী বাহিনীর মধ্যে নারীদের আলাদা জায়গা ছিল। চাণক্য সেখানে নারীর বুদ্ধি, ক্ষিপ্রতা, সাহসের প্রশংসা করেছেন, বেশি ভরসা করেছেন। তাই গুপ্তচর বৃত্তিতে নারীদের নিয়োগ ছিল একচেটিয়া। গণিকাদের যে সম্মান ছিল সেটা কি উদারতার পরিচয় নয়? একাকী নারী, দুঃস্থ, অসহায়, বিধবা, শারীরিক অক্ষম নারীদের স্বাবলম্বী করার জন্য তাদের সুতো কাটার কাজ দেওয়া হতো। এদের কাউকে জোর করে যৌন জগতে ঠেলে দেওয়া হতো না। নিজেদের উপার্জন নিজেরা করে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছিল রাষ্ট্র। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কি নারীবাদের বক্তব্য নয়?

প্রাচীন ভারতে নারী ও পুরুষ তাদের কর্মের ভিত্তিতে পৃথক মর্যাদা পেত। সন্তান জন্ম দেওয়া যেহেতু একটা দেশের লোকবলের বড়ো উপায়, তাই সেই জন্মের প্রথাকে কখনোই ছোটো করা হয়নি। সন্তানের জন্ম দেওয়া প্রধান কর্তব্য হলেও নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক যৌন জীবনে নিষেধাজ্ঞা ছিল না। যৌনতা উপভোগ, তার প্রতি সঠিক ভাবনা, যৌন শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। ঋষি বাৎস্যায়ন তার কামসূত্র গ্রন্থে চার পুরুষার্থের মধ্যে কামকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। হিন্দুধর্মে যেহেতু প্রত্যেক উপাদানকেই দেবতা জ্ঞানে পুজো করা হয়, তাই সেখানে কামদেবের উৎপত্তি। চার্চের মতো যৌনতাকে পাপ বলে বর্জন করার ডাক দেয়নি ভারতীয় সভ্যতা। বরং নর-নারীর স্বাভাবিক জীবন অর্ধনারীশ্বর রূপে পূজিত হয়েছে। সেখানে নারী সত্তা দমনের স্বার্থে 'মিশনারী' নামে রতিক্রিয়া প্রচলন চালানো হলো, যেখানে পুরুষের উপভোগ ও প্রভাব বেশি হবে এবং নারীর প্রভাব সব থেকে কম হবে ইত্যাদি রীতি হিসেবে প্রচার করা হলো সারা ইউরোপে। যদি ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা নারীর অধিকার সুনিশ্চিত না করত, তবে ৬৪ কলার সৃষ্টি হতো না। মন্দিরের গাত্রে ভাস্কর্য খোদিত হতো না, সবার শেখার উদ্দেশ্য নিয়ে। আর মধ্য প্রাচ্যের সভ্যতা আরও এক কাঠি এগিয়ে, নারীর যৌন অঙ্গচ্ছেদ করে তাকে শুধুমাত্র গহ্বরে রূপান্তরিত করেছে, যে শুধু সন্তানের জোগান দেবে নিয়মিত উৎপাদন কারখানার মতো, কিন্তু ব্যক্তিগত যৌন আনন্দ বা রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে চিরদিন। উলটোদিকে পুরুষের যৌন অঙ্গচ্ছেদ করা হবে, যাতে সে আরও বেশি যৌনতা উপভোগ করতে পারে। অদ্ভুত, সত্যিই অদ্ভুত! যে সমাজে কন্যা পূজিতা হয়, যে সমাজে পুরুষ দেবতার শক্তি হিসেবে নারী দেবীর পুজো হয়, যেখানে পৃথিবীকে নারী রূপে, দেশকে মাতৃরূপে পুজো করা হয়, তারা নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করছে? যেখানে নারী তার পুরুষ সঙ্গীর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সঙ্গী, সেখানে তার অধিকার খর্ব হচ্ছে? যে সমাজে আজ পরিবার নেই, কোথাও আবরণের আড়ালে পরিবার অতল গিরিখাতে প্রবেশ করেছে, তাদের কাছ থেকে নারীবাদের উদারতা শিখতে হবে? যে সভ্যতায় কখনোই সতীচ্ছদ দিয়ে সতীত্বের বিচার হতো না, যেমন ভারতের পঞ্চসতীর জীবনে একাধিক পুরুষ ছিল এবং তারা প্রাতঃস্মরণীয়া। আমাদের সংস্কৃতি নদীকেও মাতা বলে পুজো করতে শেখায়। ঋতুকালীন যে অন্তরীণ থাকার নিয়ম, তা সংক্রমণ রোধ করতে, তা নারীকে বিশ্রাম দিতে, তা নারীকে তার দুর্বল অশক্ত শরীরকে পুরুষের হাত থেকে বাঁচাতে। সেখানে কোনো বৈষম্য নেই। যে সমাজে গণিকাদের আভিজাত্য স্বীকার করা হয়েছিল, সেখানে সমান অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করতে হয় না। কারণ লড়াই করতে গেলে লড়াইয়ের কারণ লাগে। বেদ থেকে শুরু করে সমস্ত ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মসূত্রে কোথাও আত্মহত্যা সমর্থন করা হয়নি। কাজেই সতীদাহ প্রথা চালু হলো কীভাবে? নারী তার শত্রুর হাতে লাঞ্ছিত, ধর্ষিত হওয়া থেকে বাঁচতে লেলিহান আগুনকে আলিঙ্গন করতে বাধ্য হয়েছে। হিন্দু শাস্ত্রের কোথাও এটা বাধ্যতামূলক নিয়ম ছিল না। রাজা দশরথের পরে তার তিন রানি জীবিত ছিলেন। রাজা শান্তনুর মৃত্যুর পর সত্যবতী জীবিত ছিলেন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর কুন্তী জীবিত ছিলেন, মাদ্রী স্বেচ্ছায় সহমরণে গিয়েছিলেন, কারণ হয়তো পাণ্ডুর মৃত্যুর জন্য তিনি নিজেকেই দায়ী করেছিলেন। যে সমাজে রাজা শ্রীরামচন্দ্রকেও বিবাহের জন্য হরধনু ভঙ্গ করতে হয়, সীতার অনুমতির অপেক্ষা করতে হয়, সেই সভ্যতার বিরুদ্ধে লিঙ্গ বৈষম্য ছিল বলে চেঁচামেচি করবে? যে সমাজে রাবণের মতে প্রতিপত্তিশালী রাজা অপহরণ করেও সীতার অনুমতির অপেক্ষা করে, সেখানে নারীর ইচ্ছার মূল্য ছিল না? দ্রৌপদী ও কৃষ্ণের বন্ধুত্ব এক অনন্য নজীর তৈরি করেছে। আমাদের মহাকাব্য, আমাদের শাস্ত্র, আমাদের নিয়মাবলীতে নারী তার স্বতন্ত্র সত্তায় বিরাজ করছে হাজার হাজার বছর ধরে। সেখানে বাইরের লোকের ভয়ে পরিবর্তন করা হয়েছে নারীকে রক্ষা করার তাগিদে। নারীবাদের বস্তুগত সংজ্ঞা পাশ্চাত্য সভ্যতা ধ্বংস করে দিচ্ছে। ভারতে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা অন্যের থেকে শেখা নয়। ভারতীয় সমাজে নারী ও পুরুষ একসঙ্গে নিজের নিজের প্রয়োজনে চলতে থাকবে, বুলি আওড়াতে হবে না। আত্মিক, জাগতিক ভাবেই সে নারীর গুণমুগ্ধ, শ্রদ্ধাশীল, কৃতজ্ঞ। ভারতীয় সমাজ প্রেমে, ভালোবাসায়, পারস্পরিক বিশ্বাসে ভরে উঠুক, আমরা ভারতীয় সভ্যতায় আবার যেন সভ্য হই, আবার জাগ্রত হই। ▯

করোনা নিয়ে মমতার মতো রাজনীতি করেন না মোদী

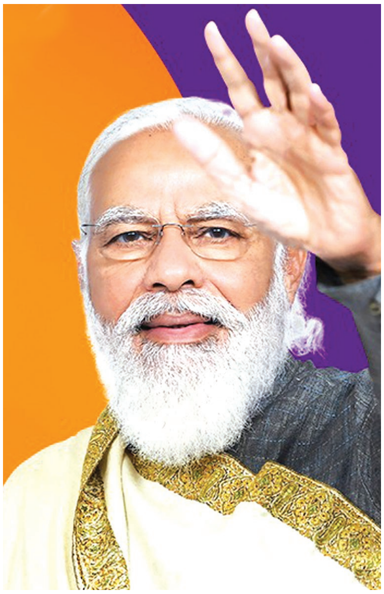

জাহ্নবী রায়

রাজ্যে চলছে ভোট যুদ্ধ। কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে। এই সুনামিতে ছন্নছাড়া অবস্থা। গত ১৩ মাস আগে আসা করোনা ঢেউয়ের থেকে এবারের ঢেউয়ের শক্তি অনেকাংশেই বেশি। আক্রান্তের সংখ্যার নিরিখে বিশ্বেও একেবারে প্রথমের দিকে আমাদের দেশ। এই সংকট কীভাবে মোকাবিলা করে দেশবাসীকে রক্ষা করা যায়, সেই চেষ্টাই করে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ইতিমধ্যেই নানা ভাবে দেশবাসীর পাশে দাঁড়িয়ে করোনা নিরাপত্তা দিয়ে চলেছে দেশের বিজেপি সরকার। অন্যদিকে প্রায় কিছুই না করে অহেতুক একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে, রাজনীতির ময়দানে মানুষের করোনা কেন্দ্রিক অসহায় অবস্থাকে কাজে লাগাতে চাইছেন রাজ্যের শাসক দল তৃণমুল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি। ভোটের ময়দানে করোনা সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে সাধারণ মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে, তিনি এটিকে ‘মোদী মেড’ বলে আখ্যা দিয়ে সস্তার রাজনীতি করেই চলেছেন। যেমনটি তিনি ২০২০ সালে করেছিলেন, পরে যখন বুঝতে পেরেছিলেন, তখন সাধারণ মানুষের যে সংকটের একেবারে গভীরে তলিয়ে যাবার অবস্থা হয়েছিল, এবারও সেটাই হয়ে চলেছে। তিনি ভেবেই নিয়েছেন যে হয়তো তিনি আর ক্ষমতায় আসবেন না। তাই হয়তো তিনি মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন অবলীলায়। তিনি খেলায়, মেলায়, পুজোয় যতটা অনুদান দিয়েছিলেন, তাঁর থেকেও অনেক কম টাকার একটি করোনা তহবিলের সূচনা করলেন ভোটের জনসভায় দাঁড়িয়ে। ১০০ কোটি টাকার এই তহবিল কী কাজে আসবে? সেই প্রশ্ন আসছে স্বাভাবিক ভাবেই। গত ১০ মাস সুযোগ পেয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী করোনা পরিস্থিতিকে সামাল দেবার। গত ১০ মাস ধরে সুযোগ পেয়েছিলেন স্বাস্থ্যের পরিকাঠামো তৈরি করতে। কেন তিনি পারলেন না সেই প্রশ্নও উঠছে। অন্যদিকে রাজ্যের প্রধান, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি কেন কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীর ডাকা বৈঠক এড়িয়ে চলেছেন, সেটা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে এখন।

অন্যদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারে বারে এই করোনা পরিস্থিতি নিয়ে দেশের বিজেপি

জরুরি ভিত্তিতে ভারতীয় বিমান বাহিনীর সাহায্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে অক্সিজেন।

সরকারকে কাঠ গড়ায় তুলছেন। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে রাজ্যের তৃণমূল সুপ্রিমোর কাছে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নিরাপত্তা দেবার থেকে রাজনৈতিক ভাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে একটা গিমিকের বাতাবরণ তৈরি করা। রাজ্যে তিনি অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা দেবার কথা বারে বারে ঘোষণা করেন। সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তিনি জেলায় জেলায় করেছেন বলে মঞ্চে দাঁড়িয়ে সগর্বে বলেন। অথচ সেইসব জেলার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিজে আপাতকালীন পরিষেবা নেবার ভরসা পান না। সাধারণ মানুষ দেখেছে নন্দীগ্রাম থেকে কলকাতায় গ্রিন করিডর করে তাঁকে চলে আসতে। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নামক উন্নয়নের বিষয়টি কত ভুয়ো।

রাজ্যে গত বছর করোনা পরিস্থিতি সামাল দেবার নামে বহু কোভিড হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছিল। এবং সেগুলিকে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে। এবছর দেখা গেল সেই সব হাসপাতালের অধিকাংশ পরিকাঠামোগত অস্তিত্বের সংকটে। একদিকে শয্যা সংকট, অন্যদিকে চিকিৎসা পরিষেবা পাবার সংকটে জেরবার সাধারণ মানুষ। তাহলে রাজ্যের প্রধান কোন মুখে সমালোচনা করেন কেন্দ্রের। কেন তুলে দেওয়া হলো কোভিড শয্যা, কেন বন্ধ করে দেওয়া হলো সেফ হোম, কেন আবার বর্তমান পরিস্থিতি সামাল দিতে আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হচ্ছে, সেই প্রশ্নের উত্তর কি তিনি দেবেন? রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য তিনি কোনো ইস্যু না পেয়ে, নিজের অপদার্থতা ঢাকার পথ খুঁজতে গিয়ে করোনার নিরাপত্তা দেবার বিষয়টা গা থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্য কেন্দ্রকে দুষছেন। তিনি বারে বারে করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে পত্রাঘাতের রাস্তা বেছেছেন। ইতিমধ্যেই কেন্দ্র রাজ্যে ৬০ বছরের উর্ধ্বে ও ৪৫ বছরের উর্ধ্বে যাদের বয়স, তাঁদের বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেবার বিষয়ে সাহায্য করেছে। সেই ভ্যাকসিন পাঠিয়েও দিয়েছে। সাধারণ মানুষ ইতিমধ্যেই সেই ভ্যাকসিনের প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ অনেকেই নিয়েও ফেলেছেন। ফলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার ব্যাপারটি যে একেবারেই ঠিক নয় সেটাও প্রমাণিত।

গত দশ মাসে আমাদের দেশ করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে পরনির্ভরতা ছেড়ে একেবারে স্বনির্ভর। সবচেয়ে বড়ো কথা, করোনার ভ্যাকসিন আমরা, আমাদের দেশেই তৈরি করছি। যেটা গোটা বিশ্বের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ, তার মোকাবিলা করে এগিয়ে যাবার শপথ নিয়ে, সেই শপথ পালনে বদ্ধপরিকর কেন্দ্রের মোদী সরকার। গত বছর ঠিক এই সময়ে সামান্য একটা পরীক্ষা কিটের জন্য তাকিয়ে থাকতে হয়েছিল বাইরের দেশের দিকে, আর এখন বিশ্বের অন্য দেশ আমাদের কাছে কিট কেনার জন্য বা পাবার জন্য সাহায্য প্রার্থী। বর্তমানে ভারত করোনা পরীক্ষা কিট তৈরি করছে। আমাদের রাজ্যেও আসছে সেই কিট। ফলে দেশের সাধারণ মানুষ জরুরি ভিত্তিতে পরীক্ষা করিয়ে নেবার সুযোগ পাবার পাশাপাশি, উপযুক্ত চিকিৎসা জরুরি ভিত্তিতে করিয়ে নিয়ে, নিজেকে সুস্থ করে তুলছেন। এটা করোনা সংক্রমণ থেকে সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দেবার বিষয়ে অন্য দেশের থেকে অনেকটাই এগিয়ে। আমাদের দেশে আক্রান্তদের সুস্থতার হার শতাংশের হিসেবে অন্য দেশের তুলনায় অনেকটাই বেশি, আর মৃত্যুর হার অনেকটাই কম। এছাড়াও এখন মাস্ক থেকে পিপিই কিট বা অন্য সব করোনা মোকাবিলা সরঞ্জাম দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের সদিচ্ছায় দেশেই উৎপাদন করা হচ্ছে, একেবারে কুটির শিল্পের আওতায় এনে। আর এটাও একটা আর্থিক দিক থেকে কর্মসংস্থানের সুযোগ যেমন সৃষ্টি করেছে, তেমনি আবারো বলা যেতে পারে, পরনির্ভরতা কমিয়ে দিয়েছে।

দেশের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের বিজ্ঞানীদের করোনা নিয়ে দ্বিতীয় ঢেউয়ের ব্যাপারে যে ভবিষ্যৎ আভাস দিয়েছিলেন, তাঁকে মান্যতা দিয়ে দেশকে করোনা নিয়ে আত্মনির্ভরতার পথে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, এই অল্প সময়েই। যেটা গোটা দেশের ক্ষেত্রে, সাধারণ মানুষকে এখন অনেকটাই করোনা নিয়ে অহেতুক আতঙ্কের মানসিকতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছে।

সস্তার ভোট রাজনীতিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেশের প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করছেন। মাননীয়ার কাছে একটা জিজ্ঞাসা, প্রধানমন্ত্রীকে চিন্তা করতে হচ্ছে ১৩০ কোটি দেশবাসীকে নিয়ে, তাঁদের জীবন নিয়ে, তাঁদের বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়ে। সেভাবেই তিনি গত দশ মাসে দেশকে একেবারে করোনা মোকাবিলার জন্য তৈরি করে ফেলেছেন। মাননীয়া আপনি সাধারণ মানুষকে কি ভ্যাকসিন নিয়ে কোনো ভুল বোঝাতে পারবেন? আজ সাধারণ মানুষ করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে নিজেকে নিরাপদ মনে করছেন। সেই নিরাপত্তার জায়গা থেকে অতল ভয়ংকর গভীরে তলিয়ে যাবার পথ আপনার হাত ধরে কেউ যেতে চাইবেন না।

এবার আসা যাক প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোলা মাননীয়ার অক্সিজেন নিয়ে আক্রমণের বিষয়টি নিয়ে। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশে অক্সিজেন সংকট একেবারেই নেই। তবুও সাময়িক যে অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে, যেটা আকস্মিক। সেটা দূর করতে তিনি যখন নিজের তাৎক্ষণিক অসহায় অবস্থার কথা প্রকাশ করছেন, সেই সময় তাঁর পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছে টাটা গোষ্ঠী ও রিলায়েন্স গোষ্ঠী। আর সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার, এদের সাহায্যের জন্য সঙ্গে সঙ্গে সাধুবাদ জানিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এটাই তো একজন অভিভাবকের মতো কাজ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সস্তার রাজনীতি করে, গিমিকের রাজনীতি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছেন, আর দেশের প্রধানমন্ত্রী সেক্ষেত্রে একজন দায়িত্বশীল অভিভাবকের ভূমিকায়, দেশের মানুষকে নিজের সন্তান তুল্য মনে করে তাদের রক্ষার জন্য চেষ্টা করে চলেছেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী গত ২১ এপ্রিল একটি ট্যুইট বার্তায় রাজ্যে ভোট প্রচার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। তিনি মনে করেছেন, রাজনীতির থেকে মানুষের পাশে এই মুহূর্তে দাঁড়ানো দরকার। তিনি রাজনৈতিক সভার থেকে কীভাবে করোনা সুনামি আটকানো যায় সেই রাস্তা খুঁজতে জরুরি বৈঠকে থাকাটাকে একেবারে প্রাধান্য দিয়ে, সবার আগে দৃষ্টান্ত রেখেছেন, এটা একজন দায়িত্বশীল রাষ্ট্রপ্রধানের মানবিকতার পরিচয় শুধু দিল না, দিল এক দায়িত্ববান প্রশাসকের পরিচয়ও।

ভোটের রাজনীতিতে মাননীয়া আপনি এখানেই হেরে গেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর দলের কাছে, তাঁদের মানবিকতার কাছে। আপনি যতই চিৎকার করে করোনাকে নিয়ে রাজনীতি করুন, মানুষ সব দেখছে। তারা ভ্যাকসিন নেবার জন্য যখন যাবেন, তখন একবার হলেও সাধুবাদ জানাবেন মোদীর এই দেশকে আর দেশের সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়াটাকে। ▌

ভারতবাসীর কাছে মহাবীর হনুমানও শ্রীরামচন্দ্রের মতোই পূজনীয়

গোপাল চক্রবর্তী

যুগ যুগ ধরে মহাবীর হনুমান পবননন্দন হিসাবে দেবতার প্রতিনিধিস্বরূপে কল্পিত হয়ে আসছেন। একইভাবে উপনিষদীয় যুগেও দেখতে পাই 'কপি' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থ বহন করে চলেছে। মহাকাব্যের যুগে বিষ্ণুর অবতার রূপে রামচন্দ্র ও বায়ুদেবতার পুত্রস্বরূপ হনুমানের অবতারত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে দেশ-বিদেশীয় রামকথায়, প্রাদেশিক রামায়ণে, তুলসী দাস, কৃত্তিবাস প্রমুখের রচনায়, সংস্কৃত কাব্য, নাটকাদি এমনকী বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যেও হনুমানের গৌরবগাথা কীর্তিত হয়েছে।

জন্মবৃত্তান্তের মধ্য দিয়ে আদি কবি হনুমান চরিত্রটির অতুল ঐশ্বর্য ও বৈভব্যের ইঙ্গিত আমাদের দিয়েই দিয়েছেন। অপ্সরা পুঞ্জকাস্থলী এক ঋষির অভিশাপে ভূতলে বানরকুলে জন্ম নেন বানররাজ কুঞ্জরের কন্যা অঞ্জনা রূপে। সুমেরু পর্বতের বানরাধীশ কেশরের সঙ্গে অঞ্জনার বিবাহ হয়। এই অঞ্জনার রূপে মোহিত হয়ে পবনদেব তাকে আলিঙ্গন করেন। পবন দেবের আশীর্বাদে অঞ্জনা এক মহাপরাক্রমশালী, বুদ্ধিমান, পবনদেবের ন্যায় বলশালী পুত্র লাভ করেন। পবনদেব হলেন 'যথাবশংচরতি' অর্থাৎ স্বেচ্ছাবিহারী, তাই পবননন্দন হনুমানও স্বেচ্ছা বিহারী। হনুমানের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন মত প্রদর্শিত হয়েছে। শিব পুরাণে উল্লেখ আছে স্বয়ং শিবই হনুমানের জন্মদাতা। সমুদ্র মন্থনের পর বিষ্ণুর ভুবনমোহিনী রূপ দেখে শিব কামমোহিত হয়ে পড়েন এবং এতে তাঁর রেতঃপাত হয়। এই রেত গৌতম কন্যা অঞ্জনির কর্ণে প্রবিষ্ট হলে অঞ্জনি গর্ভবতী হন এবং বীরপুত্র হনুমানের জন্ম দেন। আবার শিবপুরাণে শিব স্বয়ং বলেছেন--- রামানুজ লক্ষ্মণ শেষনাগের অংশাবতার, রামচন্দ্র বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার এবং হনুমান রুদ্র বা শিবের পূর্ণ অবতার অর্থাৎ রুদ্রাবতার। স্কন্ধ পুরাণে শিবের অবতাররূপে হনুমানের আবির্ভাবের কাহিনি জানা যায়। কূর্ম পুরাণেও হনুমানকে শিবের অবতার বলা হয়েছে। তবে এই পুরাণের বর্ণনায় হনুমানকে শিবের খণ্ড-অবতার রূপে চিত্রিত কথা হয়েছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণে শিবের হনুমান রূপে আবির্ভাবের কথা বর্ণিত হয়েছে। দেবী ভাগবত পুরাণে স্বয়ং বিষ্ণুর রামরূপে, শেষনাগের লক্ষ্মণরূপে অযোধ্যায় দশরথের পুত্র রূপে, আবার স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর পৃথিবীর কন্যারূপে মিথিলায় আবির্ভাবের কথা জানা যায়। অন্যদিকে পবনদেব, বিশ্বকর্মা ও অন্যান্য মুখ্য দেবগণের অংশে মহাবীর হনুমান, নল, নীল, সুগ্রীব প্রভৃতি বানর বীরদের জন্ম হয়। পদ্মপুরাণ ও নারদীয় পুরাণে হনুমান স্বয়ং নিজেকে শিবভক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। আনন্দরামায়ণে হনুমানকে দশরথের যজ্ঞভাণ্ডার 'অজ্ঞনপর্বত' থেকে জাত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অদ্ভুতরামায়ণে হনুমান ও শিবকে অভিন্নরূপে দেখানো হয়েছে। এইভাবে বিভিন্ন পুরাণে হনুমানের যে জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত হয়েছে তা হনুমানের অলৌকিকত্বকেই প্রতিপন্ন করে।

বাল্মীকি রামায়ণেও হনুমানের জন্ম ও শৈশব বৃত্তান্ত তাঁর অসাধারণত্বের পরিচায়ক। দৈবশক্তিতে জাত হনুমান শৈশব থেকেই অমিত বিক্রমশালী। বাল্যে স্বভাবতই চপল স্বভাব হনুমান ক্রীড়ারত, মা অঞ্জনা অন্যত্র তখন অরুণাচলে উদীয়মান বালার্ক। হনুমান পাকা ফল মনে করে উদীয়মান সূর্যকে ধরবার জন্য আকাশে উড্ডীন হয়। সূর্যের তেজরাশি বালকের ক্ষতি করতে পারে, তাই স্নেহময় পিতা পবনদেব শীতল স্পর্শে তাকে সহস্র যোজন পথ অতিক্রম করতে সাহায্য করেন। সূর্যের সমীপবর্তী হলে হনুমান রাহুকে দেখতে পায় এবং তাকে আক্রমণ করে বসে। ইন্দ্র রাহুর সাহায্যের জন্য ঐরাবতকে প্রেরণ করেন। বালক হনুমান বিচিত্র ঐরাবতকে দেখে রাহুকে ছেড়ে ঐরাবতকে আক্রমণ করে বসল। এক বানর শিশুর এহেন

চপলতায় বিরক্ত হয়ে ইন্দ্র তাকে বজ্রদ্বারা মৃদু আঘাত করেন। বজ্রাঘাত প্রতিরোধ করার শক্তি বালক হনুমানের ছিল না, সে পতিত হল এক পর্বত গাত্রে। সেই আঘাতে তার বাম হনু বা চোয়াল ভেঙে যায়। পুত্রের এহেন দশা দেখে পবনদেব ইন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হন। তখন ব্রহ্মা পবনদেবকে শান্ত করে আপন করস্পর্শে শিশুটিকে সুস্থ করে তোলেন। শিশুর বিক্রমে আকৃষ্ট উপস্থিত দেবগণ প্রসন্ন চিত্তে বরপ্রদানে শিশুটিকে মহাশক্তিশালী করলেন। ইন্দ্র এই বানর শিশুর নামকরণ করলেন এই বাক্যে—'আমার হস্তনিক্ষিপ্ত বজ্রে এই শিশুটির হনু ভঙ্গ হয়েছে তাই এই শিশু কালে বানরশ্রেষ্ঠ 'হনুমান' নামে খ্যাত হবে। সূর্য তাঁর তেজের শতাংশ হনুমানকে দান করে যথাসময়ে তাকে শাস্ত্রজ্ঞান দিয়ে বাগ্মী করে তোলার অঙ্গীকার করলেন। বরুণ, যম, কুবের প্রমুখ দেবগণও নানারূপ বরে অনুমানকে শক্তিশালী করে তুললেন। ব্রহ্মা বললেন—'পবনদেব, তোমার এইপুত্র অমিত্রগণের ভয়প্রদ, মিত্রগণের অভয়প্রদ, অজেয় কামরূপী, অব্যাহত গতি ও কীর্তিমান হবে।'

হনুমান অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন। রামায়ণের বিভিন্ন কাণ্ডে হনুমানের আকৃতিগত সৌন্দর্যের বহু বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে— 'শালিশূকনিভাভাসং' শালিধানের অগ্রভাগ সদৃস পিঙ্গলবণ 'কাঞ্চনশৈলাভস্তরুণার্কনিভাননঃ'। হনুমানের বদনমণ্ডল তরুণ সূর্যের ন্যায় তাম্রাভ।

'চাক্ষুষী সৎপ্রকাশতে চন্দ্রসূর্যাবিবস্থিতৌ।' তাম্রবর্ণ নাসিকাযুক্ত তাম্রাভ মুখমণ্ডলে হনুমানের বিশাল নয়নযুগল চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় প্রদীপ্ত। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে অশোকবনে বন্দিনী সীতা শিংশপাবৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপনকারী হনুমানকে দেখে যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তা থেকে জানা যায় যে হনুমান ছিলেন শুক্লাম্বর পরিহিত বিদ্যুতের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ও তপ্ত সুবর্ণের ন্যায় নয়নযুক্ত।

লঙ্কাকাণ্ডেই দেখা যায় হনুমান যখন মেঘনাদের ব্রহ্মাস্ত্রে বদ্ধ হয়ে রাবণের রাজসভায় আনীত হন তখন রাবণের আদেশে মন্ত্রী প্রহস্ত হনুমানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ','বানর তুমি নির্ভয়ে বল তুমি কার চর? ইন্দ্রের, কুবেরের, যমের না বরুণের? তুমি,তো সাধারণ বানর নও। তোমার তেজোদ্দীপ্ত দেহ দেখে তোমাকে দেবতার চর বলে মনে হচ্ছে।'

প্রহস্তের এই বাক্যে হনুমানের অপরূপ অঙ্গসৌষ্টবের ধারণা করা যেতে পারে। কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দেখি সীতার অন্বেষণে রাম লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত। এদিকে বালীর ভয়ে সুগ্রীব হনুমান-সহ বিশ্বস্ত অনুচরদের নিয়ে ঋষ্যমূক পর্বতে অবস্থানরত। সশস্ত্র রাম লক্ষ্মণকে দেখে ভীত সুগ্রীব বললেন—

'হে আমার সুহৃদগণ, ওই দেখ অস্ত্রধারী দুজন, ওরা নিশ্চয় আমাকে হত্যা করার জন্য বালীর প্রেরিত গুপ্তচর।'

ভয়ার্ত সুগ্রীবকে অভয় দিয়ে অমাত্য হনুমান বললেন—

—'আপনি বিচলিত হবেন না। মতঙ্গমুনির অভিশাপে বালী কদাপি এই ঋষ্যমূক পর্বতে আসতে পারবে না। আপনি অনুমতি করলে ওই শস্ত্রধারীদের পরিচয় আমি জেনে আসতে পারি।'

সুগ্রীবের অনুমতিক্রমে হনুমান ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে রাম লক্ষ্মণের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করে বলতে লাগলেন—

'আপনারা দেবকান্তি। সর্বাঙ্গে রাজকীয় গরিমা প্রকাশ পাচ্ছে। তা হলে আপনারা জটামণ্ডল চীরবল্কলধারী হয়ে কঠোরতপা ব্রহ্মচারীর মতো এই বিজন অরণ্যে কেন বিচরণ করছেন? আপনাদের দৃষ্টিতে সিংহের বিক্রম। বৃষকন্ধ বীরের মতো মন্থর গতি। কিন্তু নিঃশ্বাসে যেন শোকের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। হস্তে শরাসন, কোষমুক্ত কৃপাণ। আপনাদের দেখে অরণ্যের প্রাণীকুল ভয়ার্ত হয়ে আছে। আপনারা দেবাকৃতি মানুষ। আপনারা কি দেবলোক থেকে এখানে আগমন করেছেন? এই পর্বতে ভ্রাতা কর্তৃক রাজ্য থেকে বিতাড়িত সুগ্রীব নামে এক ধার্মিক বনাররাজ থাকেন। আমি তাঁরই মন্ত্রী পবন নন্দন হনুমান।'

হনুমানের পরিচয় পেয়ে রাম লক্ষ্মণ অশেষ প্রীত হলেন। রাম বললেন যে বানর রাজ সুগ্রীবের আমরা সন্ধান করছি, ইনি তাঁরই মন্ত্রী। এঁর বাক্য শুনে মনে হয়, ইনি ঋক্, সাম, যর্জুবেদে সুপণ্ডিত। স্বরাক্ষর নিপুণ, ইঙ্গিতজ্ঞ, বাক্পটু। ইনি নিশ্চয় বিশেষভাবে ব্যাকরণ অধিগত করেছেন। কথার মধ্যে একটিও অপশব্দ নেই। নির্ভুল সুললিত উচ্চারণ। মধুর কণ্ঠস্বর হলেও মিতবাক্। ইনি শান্ত মধ্যমস্বরে কথা বলেন। কথা বলার সময় চোখে মুখে ললাটে এবং অবয়বে কোনো বিকার দেখলাম না। এঁর কথা শুনলে মনে আনন্দ হয়। লক্ষ্ম ণ তুমি এর সঙ্গে আলাপ কর। (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৩/২৬-৩৫)। মূলত হনুমানের আগ্রহে এবং মধ্যস্থতায় রামচন্দ্রের সঙ্গে সুগ্রীবের মিত্রতা স্থাপন হয়। সীতা উদ্ধারে হনুমান আগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আর্যাবর্ত থেকে বহু যোজন দক্ষিণে কিষ্কিন্ধার অধিবাসী হনুমানকে দেখে তিনি অগ্নিচয়ন করছেন। মন্ত্র উচ্চারণ করে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে আর্যদের মত অগ্নিপূজা করছেন– জনয়ামাস পাবকম্। দীপ্যমানং ততো বহ্নিং পুষ্পৈরভ্যার্চ্য সৎকৃতম্ (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৫/১৪)।

সীতা অন্বেষনে হনুমান সমুদ্র লঙ্ঘন করে লঙ্কায় যাচ্ছেন। দেবগণ হনুমানের বল বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য সর্পমাতা সুরসাকে পাঠিয়ে দিলেন। সুরসা হনুমানকে বললেন, ''আজ দেখছি দেবতারা আমার জন্য ভাল আহার্যের ব্যবস্থা করেছেন।''

একথা শুনে পবনপুত্র হনুমান বললেন —''শ্রীরামের কার্য সমাধা করে ফিরে আসি, প্রভুকে সীতা মায়ের খবর দিই। তারপর আমি নিজে এসে তোমার মুখে প্রবেশ করব। আমি শপথ করে বলছি। এখন আমাকে যেতে দাও।''

সুরসা কিছুতেই হনুমানকে ছাড়তে সম্মত হলেন না। তিনি যোজন-প্রমাণ মুখ বিস্তৃত করে হনুমানকে গ্রাস করতে চাইলেন। হনুমানও তাঁর শরীরকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে তুললেন। সুরসা যতই তাঁর মুখ বিস্তার করতে লাগলেন, হনুমানও তাঁর শরীর দ্বিগুণ আকার ধারণ করতে লাগলেন। সুরসা যখন মুখ শত যোজন বিস্তৃত করলেন হনুমান তৎক্ষণাৎ ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে তাঁর মুখে প্রবেশ করে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে করজোরে সুরসার সামনে দাঁড়ালেন।

সুরসা প্রীত হয়ে বললেন—"বৎস তোমার বল বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে আমি সন্তুষ্ট হলাম। তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য দেবতারা আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তুমি শ্রীরামের সর্বকার্য সমাধা করতে পারবে। কারণ তুমি বল ও বুদ্ধির আধার। এই আশীর্বাদ করে সুরসা চলে গেলেন। হনুমানও আনন্দিত হয়ে চলতে লাগলেন। তুলসীদাস বলছেন—

রাম কাজু সু করিহহু তুম্হ বল বুদ্ধি নিধান।

আশিস দেই গাঈসো হরষি চলেউ হনুমান।। (সুন্দরকাণ্ড, রামচরিত মানস)

তারপর অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে হনুমান লঙ্কায় উপস্থিত হলে লঙ্কিনী নামে এক রাক্ষসী তাঁর পথরোধ করে। হনুমানের মুষ্ঠাঘাতে লঙ্কিনী রক্তবমন করতে করতে বলে—

"রাবণকে বর দিয়ে যাবার সময় ব্রহ্মা আমাকে বলেছিলেন আমি যখন বানরের হাতে পীড়িত হব তখন রাক্ষসদের ধ্বংস আসন্ন বুঝতে হবে। হে বৎস, অতি পুণ্যবলে আজ আমি শ্রীরামচন্দ্রের দূত তোমাকে দেখতে পেলাম।"

এবার অতি ক্ষুদ্ররূপ ধারণ করে হনুমান লঙ্কায় প্রবেশ করে সীতাদেবীর অন্বেষণ করতে লাগলেন। হনুমান নিদ্রিত রাবণকে দেখলেন কিন্তু সীতাকে কোথাও দেখতে পেলেন না। কিন্তু এই নগরীতে পরম বৈষ্ণব রাবণানুজ বিভীষণের সঙ্গে হনুমানের সাক্ষাৎ ঘটল। বিভীষণ হনুমানকে সীতার সন্ধান দিলেন এবং কী প্রকারে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে পারে তাও সবিস্তারে বলে দিলেন। হনুমান আবার ক্ষুদ্ররূপ ধারণ করে সীতার সন্ধানে বিভীষণ কথিত অশোক কাননে উপস্থিত হলেন। এক বৃক্ষে আশ্রয় করে পাতার আড়াল থেকে সীতাকে অবলোকন করতে লাগলেন। এমন সময় রাক্ষসীদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে রাবণ সেখানে উপস্থিত হয়ে সীতাকে প্রথমে প্রলোভন দেখিয়ে ও পরে ভয় দেখিয়ে রাবণকে বিবাহ করার জন্য প্ররোচিত করতে থাকে। সীতা রাবণের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। রাবণ সীতাকে একমাস সময় দিয়ে তখনকার মতো প্রস্থান করে।

সীতা শোকে দুঃখে প্রাণ ত্যাগের পরিকল্পনা করতে থাকেন। সীতার বিরহব্যাকুল অবস্থা দেখে হনুমানের সেই এক একটি ক্ষণকে কল্পকাল বলে বোধ হতে লাগল। তখন হনুমান চিন্তাভাবনা করে সঙ্গে করে নিয়ে আসা অভিজ্ঞান স্বরূপ রামের অঙ্গুরীয়টি কৌশলে সীতার সামনে রেখে দিলেন। রামনাম খচিত অঙ্গুরীয়টি চিনতে পেরে সীতাদেবী আশ্চর্যান্বিত হয়ে অঙ্গুরীয়টি প্রাণভরে অবলোকন করতে লাগলেন। যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে তাঁর হৃদয় উত্তাল হলো। হনুমান তখন সীতাদেবীর সমক্ষে উপস্থিত হয়ে সবিস্তারে সব ঘটনা বিবৃত করলেন। রাম-লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ জানালেন। অচিরেই প্রভু রামচন্দ্র যে অপরাজেয় বানরসেনা-সহ লঙ্কা আক্রমণ করে সীতা দেবীকে উদ্ধার করবেন তাও জানালেন।

সীতাদেবীকে আশ্বস্ত করার পর হনুমান ক্ষুধায় কাতর হয়ে পার্শ্ববর্তী ফলবান বৃক্ষসমূহ থেকে সীতার অনুমতি নিয়ে ফল খেতে শুরু করলেন। এক বানরকে লঙ্কার রাজকীয় উদ্যানের ফল খেতে ও বৃক্ষাদি নষ্ট করতে দেখে রাক্ষস সেনারা হনুমানকে আক্রমণ করে। হনুমান অবলীলায় তাদের হত্যা করে। অবশেষে রাবণের বীর পুত্র অক্ষয় কুমারও হনুমানের হাতে নিহত হয়। তখন মহাবীর মেঘনাদ অনন্যোপায় হয়ে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। ব্রহ্মাস্ত্রকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য হনুমান মেঘনাদের বন্দিত্ব স্বীকার করলেন। হনুমানকে রাজসভায় রাবণের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি রাবণকে অনেক ধর্মোপদেশ দেন। এবং সীতামাতাকে ফিরিয়ে দিয়ে শ্রীরামের পায়ে আত্মসমর্পণ করে নিজেকে ও রাক্ষসকুলকে রক্ষা করার কথা বলেন। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণ শাস্তিস্বরূপ হনুমানের লেজে অগ্নি সংযোগের নির্দেশ দেন। রাক্ষসেরা সেই আজ্ঞা পালন করে। হনুমানের লেজে ভয়াবহ আগুন প্রজ্বলিত হয়। তখন নিজের বন্দিদশা মুক্ত করে হনুমান সেই লেজের আগুনে সমগ্র লঙ্কানগরী ভয়ংকরভাবে দগ্ধ করেন এবং শেষে সীতামাতার নিকট থেকে অভিজ্ঞানস্বরূপ চূড়ামণি গ্রহণ করে লঙ্কা ত্যাগ করে শ্রীরামের সকাশে উপস্থিত হন। অভিজ্ঞান দেখিয়ে রামচন্দ্রের কাছে সীতাদেবীর সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করেন। এবার বানরসেনা প্রস্তুত হলো লঙ্কা আক্রমণ করে সীতা উদ্ধারের জন্য। বিভীষণ যে লঙ্কা ও আপন স্বজনদের ত্যাগ করে রামের শরণ নিলেন তাও হনুমানের কৃতিত্ব। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের প্রতিটি সংকটের সময় পরিত্রাতা হনুমান। রাবণের শক্তিশেলে আহত লক্ষ্মণের চিকিৎসার জন্য বৈদ্যরাজ সুষেণকে লঙ্কা থেকে আনয়ন এবং তাঁর নির্দেশে গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে বিশল্যকরণী ঔষধি-সহ সমগ্র পর্বতটাকে আনয়ন মহাবীর হনুমানের কীর্তি। পাতালে মহীরাবণের কবল থেকে রাম-লক্ষ্মণকে উদ্ধার করা হনুমান ছাড়া কার সাধ্য? রাবণের মৃত্যুবাণ মন্দোদরীর কাছ থেকে হনুমানই আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান ব্যাকরণ শাস্ত্রের কঠিন সিদ্ধান্তগুলি সূর্যদেবের কাছ থেকে জানবার জন্য মহান গ্রন্থ ধারণ করে উদয়গিরি থেকে অস্তগিরি পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন। শব্দশাস্ত্রে হনুমানের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। অন্যান্য শাস্ত্রে তার সমান বিদ্বান আর দেখা যায় না। যেমন—হনুমান লঙ্কাদহনের সময়—সাম, দান, ভেদ ও পরাক্রম এই পদ্ধতি চতুষ্টয় জানতেন এবং শেষ পরাক্রমকে তিনি যে বেছে নিয়েছেন তা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। রামায়ণের দাক্ষিণাত্য পর্বে হনুমানের অধীত বিদ্যার একটি তালিকা দেওয়া আছে। তিনি সূত্র, বৃত্তি, বার্ত্তিক এবং ভাষ্যে পণ্ডিত ছিলেন। ছন্দশাস্ত্রেও হনুমান অদ্বিতীয় বিশারদ ছিলেন। তাঁকে 'নবব্যাকরণবেত্তা' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। বাল্মীকিও তাই বলেছেন হনুমান হলেন 'নিশ্চিতার্থোহর্যতত্ত্বজতঃ' কালধর্মা বিশেষবিৎ।' এইভাবে হনুমান বিদ্যা ও তপস্যায় দৈবগুরু বৃহস্পতিকে পর্যন্ত অতিক্রম করেছিলেন। মহামুনি অগস্ত্য রামচন্দ্রকে বলেছেন—রামের সহায়তার জন্য দেবপ্রেরিত মহাপুরুষরূপে হনুমান আবির্ভূত হয়েছেন। ভারতবাসীর কাছে রামচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে মহাবীর হনুমানও সম্মানীয়, আদরণীয় ও পূজনীয়। ❑

একুশ শতকেও গুরু তেগবাহাদুরজী সমান প্রাসঙ্গিক

দত্তাত্রেয় হোসবলে

ভারতের ইতিহাসে নবমগুরু তেগবাহাদুরজীর ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো দেদীপ্যমান। গুরু হরগোবিন্দ ও নানকীদেবীর ঘর আলো করে বৈশাখমাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে অমৃতসরে তিনি আবির্ভূত হন। ২০২১-এর ১ মে তাঁর জন্মের চারশো বছর পূর্ণ হলো। যে সময়ে তিনি ধরাধামে আবির্ভূত হন তখন ভারতের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মধ্য এশিয়া থেকে আগত মুঘলদের অধিকার ছিল। সেই বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে যে সমাজ পরপম্পরাগত ভাবে সংগ্রাম করছিল গুরু তেগবাহাদুর সেই পরম্পরারই প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁর জীবন ত্যাগ, তপস্যা ও সাধনার প্রতীক। তাঁর কৃতিত্ব শারীরিক ও মানসিক বীরত্বের দৃষ্টান্ত। তাঁর বাণী ব্যক্তি নির্মাণের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রয়োগ বলে মনে করা যেতে পারে। নেতিবাচক বৃত্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে সাধারণ ব্যক্তিও ধর্মের পথে চলতে পারে। নিন্দা-স্তুতি, লোভ-মোহ, মান-অভিমান প্রভৃতির চক্রব্যূহে যারা বন্দি হয়ে পড়ে, তারা সংকটে অবিচল থাকতে পারে না। জীবনে কখনো সুখ আসে, কখনো দুঃখ। সাধারণ ব্যক্তির আচরণ সেই সুখ বা দুঃখের নিরিখে বদলাতে থাকে। কিন্তু সিদ্ধপুরুষেরা আগত সুখ-দুঃখের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকেন। গুরু তেগবাহাদুরজী এই সাধনা সম্পর্কে বলেছেন, ' উসততি নির্দিআ নাহি জিহি কঞ্চন লোহ সমানি' এবং সুখ দুখ জিহ পরসৈ নহী লোভু মোহু অভিমানু' (মোহলা, নবম অঙ্গ১৪২৬)।

গুরু তেগবাহাদুর তাঁর রচনাতে বলেছেন, ' ভঈ কাহু কউ দেত নহী ভঈ মানত আন'। মৃত্যুভয় হলো সবচেয়ে ভয়ানক। মৃত্যুভয়ে মানুষ নিজের মূল্যবোধ ত্যাগ করে ধর্মান্তরিত হয়ে যায়, ভীরু হয়ে যায়-- 'ভঈ মরবে কো বিরসত নাহিন তিহ চিতা তনু জারা'। তাঁর সম্পূর্ণ জীবন ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চার পুরুষার্থের সর্বোত্তম উদাহরণ। তিনি সাফল্যের সঙ্গে গৃহীজীবনে অর্থ ও কামের সাধনার মাধ্যমে নিজ পরিবার ও সমাজে উৎকৃষ্ট মূল্যবোধ সঞ্চার করেছিলেন। ধর্ম রক্ষার জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন। সংকটের সময় আশা ও বিশ্বাস জাগায় তাঁর দৃষ্টিকোণ। তিনি বলেছেন, ' বনু হোওয়া বন্ধন ছুটে সভু কিছু হোতৈ উপাঈ'। তাঁর কর্মের দ্বারাই বাস্তবিকই দেশে শক্তি সঞ্চার হয়েছে, বন্ধন ছিঁড়ে গিয়েছে এবং মুক্তির রাস্তা খুলেছে। ব্রজভাষায় রচিত তাঁর বাণী ভারতীয় সংস্কৃতি, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার মণিকাঞ্চন যোগ।

গুরু তেগবাহাদুর নিজের বাসস্থান আনন্দপুর সাহিবকে মুঘলদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসংঘর্ষের কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। ঔরঙ্গজেব হিন্দুস্তানকে দার-উল-ইসলামে রূপান্তরিত করার ঘৃণ্য প্রয়াস করেছিল। সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হওয়ার কারণে কাশ্মীর মুঘলদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল। কাশ্মীরবাসী সর্বদাই তাঁর পথনির্দেশ চাইতেন। তিনি গভীর ভাবে ভাবনাচিন্তা করতেন। কাশ্মীর-সহ সমগ্র দেশের পরিস্থিতি ছিল সংকটাপন্ন। মুঘলদের ক্রূর চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াই কীভাবে সম্ভব? একটাই রাস্তা, কোনো মহাপুরুষকে ধর্ম ও রাষ্ট্র রক্ষার জন্য নিজের জীবন বলিদান দিতে হবে। সেই বলিদানের ফলে সমগ্র দেশে রাষ্ট্রচেতনার জোয়ার আসবে। সেই জোয়ারে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দেওয়াল ভেঙে পড়বে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রাণ বলিদান কে দেবেন? তার সমাধান করলেন তাঁরই বালকপুত্র গোবিন্দ রায়জী। তিনি পিতাকে বললেন, ' এই মুহূর্তে দেশে আপনার চেয়ে বড়ো মহাপুরুষ আর কে আছেন?' গুরু তেগবাহাদুরজী লোকজাগরণের কাজে লেগে পড়লেন।

ঔরঙ্গজেবের সেনাবাহিনী গুরু তেগবাহাদুরজী ও তাঁর তিন অনুচরকে বন্দি করে দিল্লি নিয়ে এল। তাঁদের ওপর অমানবিক অত্যাচার করা হলো। তাদের বলা হলো ইসলাম কবুল করতে। নানারকমের লোভও দেখানো হলো। কিন্তু তাঁরা ধর্ম থেকে বিচলিত হলেন না। চাঁদনিচকে তাঁর সামনেই তাঁর শিষ্য ভাই মোতিদাসের শরীর করাত দিয়ে মাঝ বরাবর চিরে ফেলা হলো। ভাই দয়ালদাসকে ফুটন্ত তেলে ভাজা হলো। ভাই সতীদাসকে সারা শরীরে তুলো বেঁধে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। মুঘলরা ভেবেছিল যে, এমন বীভৎস অত্যাচার দেখে গুরুজীর হৃদয় কেঁপে উঠবে। কিন্তু গুরুজীর বার্তা ছিল অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই-ই হলো আসল ধর্ম। তিনি অবিচল থাকলেন। কাজির আদেশে জল্লাদ গুরুজীর শরীর থেকে মাথা আলাদা করল। বাস্তবিকই গুরু তেগবাহাদুরজীর বলিদান সমগ্র দেশে চেতনার জোয়ার নিয়ে এল। দশমগুরু গোবিন্দ সিংহ তাঁর পিতার বলিদানের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—

' তিলক জঞ্জু রাকা প্রভ তাকা। কীনো বড়ো কনূ মহি সাকা।
সাধানি হেতি ইতি জিনি করী। সীস দীআ পর সী না উচরী।'

আজ সারা দেশ গুরু তেগবাহাদুরজীর জন্মের চারশোতম জয়ন্তী পালন করছে। তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করছে। আজ সর্বত্র ভোগ ও পার্থিব সুখের পিছনে মানুষ ধাবমান। কিন্তু গুরু তেগবাহাদুরজী দেখিয়েছিলেন ত্যাগ ও সংযমের পথ। আজ সর্বত্র ঈর্ষা, দ্বেষ, স্বার্থ ও বৈষম্যের প্রাবল্য। কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন সৌজন্য, সমরসতা এবং মানসিক বিকারকে জয় করার সাধনার পথ। তাঁর সাধনলব্ধ আচরণের প্রভাবেই দিল্লি যাওয়ার সময় যে যে গ্রাম দিয়ে তিনি গিয়েছিলেন সেই সমস্ত গ্রামের মানুষ আজও মাদক দ্রব্যের চাষ করেন না। উগ্রবাদ ও ধর্মান্ধতা আজ সারা বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি ত্যাগ, শৌর্য ও বলিদানের পথ দেখিয়েছেন। মানবজাতি এক নতুন পরিবর্তনে প্রবেশ করছে। এই সময়ে গুরু তেগবাহাদুরজীকে স্মরণ করার যথার্থ উপায় হলো তাঁর দেখানো পথে চলে নতুন ভারতের নির্মাণে অংশগ্রহণ করা। যে ভারতের শিকড় তার নিজের মাটিতেই।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ)

(৪০০তম জন্মবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

বাংলাদেশকে ক্রমশ মৌলবাদীরা গ্রাস করছে

রঞ্জন কুমার দে

বর্তমানে বিরোধীশূন্য বাংলাদেশ, তবুও স্বস্তিতে নেই আওয়ামি লিগ সরকার। দেশে ৭১-এর পরাজিত মৌলবাদী শক্তি এতোই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে যেন দেশ ক্রমশ ইসলামের হেফাজতে ধাবিত হচ্ছে। রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগে দেশবিরোধী তথা পাকিস্তানপন্থীরা ধর্মের বেড়াজালে দেশকে উত্তপ্ত, অস্থির করার পায়তারায় খুব তৎপর। সুক্ষ্মভাবে বাংলাদেশের রাজনীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সেখানে বিরোধীরা সম্পূর্ণ ইস্যুহীন হলেও স্থান পেয়েছে উগ্র ইসলামি অ্যাজেন্ডা তথা ফ্রান্স বিক্ষোভ, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য বিতর্ক, মোদীর বাংলাদেশ সফর ইত্যাদি। এতদিন যাবৎ কোরান শরিফের অবমাননা বা মহম্মদকে নিয়ে কটুক্তি করলে তা ইসলামের অবমাননা বলে গণ্য হতো। কিন্তু সমসাময়িককালে উগ্র মৌলবাদী সংগঠন ‘হেফাজতে ইসলামে’র কোনো নেতাকে নিয়ে সমালোচনা করলে সেটাও ইসলামের অবমাননা হয়ে যাচ্ছে। গত মাসের ১৭ তারিখে সুনামগঞ্জের শাল্লায় হেফাজত নেতা মামুনুল হককে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনা করলে ইসলাম অবমাননার অভিযোগে পুরো একটি হিন্দু গ্রামে তাণ্ডব ও ধ্বংসলীলা চালানো হয়। স্বাধীনতার বিরোধী মৌলবাদী শক্তির অনেক রাজাকার, আলবদর ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলালেও এবং তাদের রাজনৈতিক সংগঠন জামাত-ই-ইসলামিকে সরকার নিষিদ্ধ করলেও তাদের দোসররা শুধুমাত্র খোলস বদলে হেফাজতে ইসলামে আশ্রয় নিয়েছে।

হেফাজতে ইসলাম সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে সবচেয়ে আলোচিত এবং বিতর্কিত একটি নাম। ধর্মীয় এই সংগঠনটি সম্পূর্ণ কওমী মাদ্রাসা ভিত্তিক হলেও তাদের কার্যকলাপ, সক্রিয়তা দেশটির অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে হস্তক্ষেপ করছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফরের বিরোধিতা করে বিক্ষোভ প্রদর্শনে সংগঠনটির প্রায় ১৭ জন নিহত হয়। সরকারি হিসেবে উগ্র এই ধর্মান্ধরা আন্দোলন চলাকালীন পৌরসভা কার্যালয়, বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল, সুর সম্রাট আলাউদ্দিনের সংগীতাঙ্গন, সদর উপজেলা ভূমি অফিস, প্রেস ক্লাব প্রভৃতি প্রায় ৭৭ কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট করে, যার মধ্যে ৭২ কোটি শুধু ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়ই। উল্লেখ্য, ৩২ লক্ষ জনগোষ্ঠীর এই জেলাটিতে ৫৭৪টি মাদ্রাসায় ১ লক্ষ ছাত্র রয়েছে এবং হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের জন্য জেলাটির বিশেষ পরিচিতি আছে। কারণ অতীতের মতো এবারেও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১২১ বছরের একটি প্রাচীন কালী মন্দির থেকে প্রায় ৩৫ ভরি স্বর্ণালঙ্কার, ৬৯ ভরি রুপোর অলংকার

ও বাসনপত্র লুটপাট করে প্রতিমা ভাঙচুর করে এই মৌলবাদীরা। অনুরূপভাবে একই সময়ে বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলায় হাট ফুলবাড়িতে হিন্দুদের বাসস্থানে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও ভাঙচুর চালানো হয়। বাংলাদেশের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত প্রকৃতপক্ষে ওয়ানওয়ে ট্রাফিক, কারণ হিন্দুদের উপর নিপীড়ন, অত্যাচার হয়ে উঠেছে রোজনামচা, দৈনন্দিন অভ্যাস। ধর্মীয় এই সংখ্যালঘু হিন্দুরা সত্যি অভিভাবকহীন। মোদীজীর বাংলাদেশ সফরকালের প্রাক্‌মুহূর্তে সুনামগঞ্জের শাল্লায় প্রায় একশো হিন্দু পরিবার আক্রান্ত হলেও কূটনৈতিক কারণে মোদীজীর মুখ থেকে সামান্যতমও অভয়বাণী শোনা যায়নি।

যাই হোক, হেফাজতে ইসলাম সাম্প্রতিককালে বিশেষ আলোচিত হলেও তাদের সূচনা ঘটে ২০১০ সালের ১৯ জানুয়ারি চট্টগ্রামের হাটবাজারি মাদ্রাসার পরিচালক প্রয়াত শাহ আহমদ শফি ওরফে তেঁতুল হুজুরের হাত ধরে। তিনি নারী ও কন্যাদের তেঁতুলের মতো মনে করতেন, তাই তিনি এই নামে বিশেষ খ্যাত ছিলেন। বাংলাদেশ সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজ ব্যবস্থা ও গতি প্রকৃতির পরিবর্তন অঙ্গীকারে শফির নেতৃত্বে হেফাজতে ইসলাম ২০১৩ সালে ঢাকার শাপলা চত্বরে ১৩ দফা দাবি বাস্তবায়নে বিক্ষোভ প্রদর্শনে সরকারি সম্পত্তি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাদের প্রথম উত্থান হয়। এই ১৩ দফা দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ব্লাসফেমি আইন প্রণয়ন, নাস্তিক ব্লগারদের শাস্তি দানের ব্যবস্থা, প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক, মাদ্রাসা শিক্ষাকে সরকারি স্বীকৃতি, কাদিয়ানীদের অমুসলমান ঘোষণা প্রভৃতি। হাসিনা সরকার সবকয়টি দাবি বাস্তবায়ন না করলেও কৌশলগতভাবে ২০১৩ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত অনেকগুলো দাবি কার্যকরী করেছে।

উল্লেখ্য, শাপলা চত্বরে হেফাজতিদের এই জঙ্গি আন্দোলনে বিরোধী শিবির বিএনপি এবং জাপার পূর্ণ সমর্থন ছিল। তাই অবস্থার বেগতিক অনুমান করে আওয়ামি লিগ সরকার কিছুটা ব্যাকফুটে যেতে বাধ্য হয়ে যায়। কওমী মাদ্রাসার শিক্ষাকে সরকারি স্বীকৃতির জন্য ১৯৯০ সাল থেকেই ইসলামি গোষ্ঠীগুলি দাবি করে আসছিল। অবশেষে শফির নেতৃত্বে ও হেফাজতের উদ্যোগে ২০১৭ সালে সরকার কওমী মাদ্রাসার দাওড়ায়ে হাদিসকে মাস্টার্স সমমানের স্বীকৃতি দেয়। সরকারের এই স্বীকৃতি বাস্তবায়নে শফির হেফাজতে ইসলাম এতটাই সন্তুষ্ট হয় যে প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে তারা 'কওমীমাতা'য় সম্বোধন করতে থাকে। ২০১৭ সালে আবার সুপ্রিম কোর্টের সামনে ভাস্কর্য স্থাপিত হলে সেটা সরিয়ে নেওয়ার দাবিতে হেফাজতে ইসলাম শাপলা চত্বরে আবার তুমুল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অবশেষে তাদের দাবি মেনে নিয়ে শেখ হাসিনাকে ঘোষণা করতে হয়, 'সুপ্রিম কোর্টের সামনে মূর্তি আমিও পছন্দ করিনি'। ২০১১ সালে সরকার নারী উন্নয়নে একটি নীতিমালা গ্রহণ করেছিল, এতে বলা হয়েছিল সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীদের সমানাধিকার দেওয়া হবে কিন্তু প্রগতিশীল এই নীতিমালা বাস্তব পরিণতি লাভ করতে পারেনি। কারণ হেফাজতিদের দাবি ছিল এটা কোরান এবং সুন্নাহর পরিপন্থী। ২০১৬ সালে এই হেফাজতিদের আরেক অভিযোগ ছিল স্কুলের পাঠ্যবইয়ে ইসলামি ভাবধারা বাদ দিয়ে 'নাস্তিক্যবাদ' এবং 'হিন্দুত্ববাদ' শেখানো হচ্ছে। ২০১২ থেকে ২০১৬-এর মধ্যে নাকি দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে ইসলামি ভাবধারার পরিবর্তনে ১৭টি বিষয় বাদ দিয়ে ৭টি নতুন কবিতা ও গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তাই ২০১৭ সালে হেফাজতের খুশিমতো পাঠ্যপুস্তকে মোট ২৯টি লেখার সংযোজন ও বিয়োজন ঘটে। তথ্যানুযায়ী নবম শ্রেণীর বাংলা বই 'সাহিত্য ও সংকলন' থেকে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' ও জ্ঞানদাসের 'সুখের লাগিয়া', ভারতচন্দ্রের 'আমার সন্তান', লালন শাহের 'সময় গেলে সাধন হবে না', রঙ্গলাল চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতা' ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাঁকোটা দুলছে' বাদ দিয়ে সংযোজিত হয় শাহ মোহাম্মদ সগীরের 'বন্দনা', আলাওলের 'হামদ', আব্দুল হাকিমের 'বঙ্গবাণী', গোলাম মোস্তফার 'জীবন বিনিময়' ও কাজী নজরুলের 'উমর ফারুক'। অনুরূপভাবে অষ্টম শ্রেণীর বাংলা দ্রুতপঠন আনন্দপাঠ থেকে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 'রামায়ণ কাহিনি' বাদ দেওয়া হয়। সপ্তম শ্রেণীর বাংলা বই সপ্তবর্ণাতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লাল ঘোড়া' বাদ দিয়ে সংযুক্ত হয় হাবীবুল্লাহ বাহারের 'মরু ভাস্কর'। ষষ্ঠ শ্রেণীর দ্রুতপঠন আনন্দপাঠ থেকে শরৎচন্দ্রের 'লালু', সত্যেন সেনের 'লাল গোরুটা' এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলাদেশের হৃদয়' বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এই মৌলবাদীরা রবি ঠাকুর রচিত বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা'র অবলোপনের জন্য বিগত কিছুদিন যাবৎ বেশ বিরোধিতা করে আসছে।

হেফাজতে ইসলাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমর্থনে এতটাই উৎফুল্ল ছিলেন যে আহমদ শফী এক প্রকাশ্য সমাবেশে বলেছিলেন, 'হাসিনা সরকার, আওয়ামি লিগ, ছাত্রলিগ সবাই আমাদের 'বন্ধু'। কিন্তু সরকার ও হেফাজতের মধ্যে এই সম্পর্ক বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। হেফাজতের প্রতিষ্ঠাতা আমির আল্লামা আহমদ শফী মারা যাওয়ার পর নতুন কমিটির কর্তৃত্ব চলে যায় জুনায়েদ বাবু নগরী ও মামুনুল হকদের কাছে। কমিটি শুরুতেই বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণে বিক্ষোভ অস্থিরতায় সরকারের প্রতি আক্রমণাত্মক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হয়। এখন আবার দেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনে হেফাজতের নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফরকে ইস্যু করে দেশ আবার অরাজকতায় মেতে উঠে। কওমী মাদ্রাসা ভিত্তিক এই সংগঠন ক্রমশ শক্তিবৃদ্ধিতে ২০১৩-এর তুলনায় ২০১৮-তে তাদের ছাত্রসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেছে। হেফাজতে ইসলামের বর্তমান প্রভাব সহজে অনুমান করা যায় যখন তাদের এক প্রতিষ্ঠিত নেতা মামুনুল হক নারীসংক্রান্ত এক কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে যায়, তখন তার অনুসরণতকারীরা মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রশাসনের নাকের ডগা দিয়ে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়। এমনকী অবস্থার বেগতিক দেখে খোদ প্রধানমন্ত্রী হাসিনা সংসদে ৪০ মিনিটের বক্তব্যে মানুনুল হককে উদ্দেশ্যে করে কিছু বলতে হয়েছে।

তবে শেষের ভালো এই যে উগ্র সাম্প্রদায়িক হেফাজতে ইসলামের মামুনুল হককে সরকার গ্রেফতার করে রিমান্ডে রেখেছে। দেশের উশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে এরকম মনে হচ্ছে, যে, ৭১-এর পরাজিত মৌলবাদী রাজাকার, আলবদরদের উত্তরসূরিরা আবার ধর্মের হেফাজতের ঢালে পাকিস্তানি শাসন ব্যবস্থা আবার কায়েম করতে পায়তারা শুরু করেছে। তাই হাসিনা সরকারকে কঠোর হস্তে এই হেফাজতি মৌলবাদীদের আজ দমন করতে হবে, নয়তো আগামী প্রজন্মের কাছে দেশের স্বাধীনতা চেতনার কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। ☐

গ্রামের ভোটকেন্দ্রে বৃদ্ধার প্রশ্ন,

‘ভোটটা কুথায় দিব বুঝতে পারছি নাই’

গৌতম কুমার মণ্ডল

একটি ভোট কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী একজন প্রিসাইডিং অফিসার। তাঁর নেতৃত্বে কাজ করেন তিনজন পোলিং অফিসার। সুষ্ঠভাবে ও আইনকানুন মেনে ভোট নেওয়া ও মেশিনপত্র-সহ ভোটের সমস্ত সামগ্রী রিসিভিং সেন্টারে জমা দেওয়া যদিও একটি টিমওয়ার্ক, কিন্তু এই টিম পরিচালিত হয় প্রিসাইডিং অফিসারকে কেন্দ্র করেই। তাই প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি ভোটের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এখানে লিপিবদ্ধ থাকে ভোট কেন্দ্রের সব খুঁটিনাটি। স্বস্তিকার পাঠকদের জন্য রইল প্রিসাইডিং অফিসারের এক অন্যরকম ডায়েরি।

এই নিবন্ধ লেখক আজ পর্যন্ত তাঁর চাকুরি জীবনে সাত-আট বার প্রিসাইডিং অফিসারের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। ফলে এই কাজটা এখন আর কোনো বাড়তি চাপ হয়ে আসে না। নানারকম ভোট মিলিয়ে আমাদের দেশে পাঁচ বছরে গড়ে তিনবার ভোট হয়। আর চাকুরিজীবীদের ভোটকর্মী হয়ে যেতেই হয়। এ থেকে কোনো অব্যাহতি নেই। অনেকে এই কাজটিকে বাড়তি ঝামেলা হিসেবে নিয়ে নেন। ইলেকশন ডিউটি কাটানোর জন্য নানারকম চেষ্টা করেন। অনেকে আদালতেও চলে যান। তবে শেষ পর্যন্ত এ কাজে কেউ সফল হন, কেউ হন না। ভোটের কাজকে বাড়তি চাপ হিসেবে নিয়ে নিলেই মুশকিল। একে আপনার চাকুরি জীবনের অঙ্গ হিসেবেই ধরতে হবে। তাছাড়া আপনি এ কাজ না করলে করবে কে, এ কথাও আপনাকে ভাবতে হবে।

ভোট বা এক একটি সাধারণ নির্বাচন আমাদের দেশে এক একটি বড়ো উৎসবের চেহারা নিয়ে আসে। দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক তাঁদের মতাধিকার প্রয়োগ করে সরকার তৈরি করেন। এই মতাধিকার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে গ্রহণ করার নামই তো ভোট। আর এই মতাধিকার গ্রহণ করার কাজটি যেমন জটিল তেমনি ব্যয় সাপেক্ষ। কত উদ্যোগ, কত পরিকল্পনা, কত কর্মদক্ষতার একত্র সমাবেশ যে এক একটি ভোট গ্রহণের পিছনে থাকে তা আমরা অনেকেই জানি না। সরকারি আধিকারিক থেকে সাধারণ কর্মচারী, পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী, পরিবহণ কর্মচারী, ছাপাখানার কর্মচারী, প্যান্ডেল ও ডেকোরেটারের লোকজন, দৈনিক মজুরির শ্রমিক থেকে হাজার হাজার ভোটকর্মী— এরকম কত লোকের কত নিরলস পরিশ্রম যে এক একটি সাধারণ নির্বাচনকে সফল করে তোলে তা আমরা কজন ভেবে দেখি। তবে শেষ পর্যন্ত ভোটের আসল কাজটা দূরদূরান্তের বুথে গিয়ে সেরে দিয়ে আসেন প্রিসাইডিং অফিসারের নেতৃত্বাধীন তিনজন পোলিং অফিসার। ভোটপর্বের শেষে বিজয় মিছিলের রঙে আবিরে এই ভোট কর্মীদের কথা আর কারো মনে থাকে না। এমনকী ভোট কর্মীদের সার্ভিস লাইফের রেকর্ড বুকেও কোথাও লেখা থাকে না যে তিনি কতগুলো ভোট উতরে দিয়ে

দেশের বা রাজ্যের সরকার গঠনের নেপথ্যে একটি বড়ো কাজ করে এসেছেন। সুতরাং খাতায়-কলমে আপনার ভোটের কাজের কোনো মূল্য নেই। কিন্তু আপনি যদি একজন অনুভূতিশীল প্রিসাইডিং অফিসার হন তাহলে এক একটি ভোট গ্রহণের অভিজ্ঞতা আপনাকে সমৃদ্ধ করবে। একেবারে বিনা পয়সায় একটি নতুন গ্রাম, জনপদ আপনার দেখা হয়ে যাবে। সেখানকার লোকজনদের আচার ব্যবহারের একটি ঝলক আপনি পেয়ে যাবেন। আপনি একেবারে মাটির কাছে গিয়ে দেখে আসবেন গণতান্ত্রিক ভারতের মূল প্রাণ-ধারাটিকে। দেখবেন ছিন্নবস্ত্র, দীনদরিদ্র, লাঠি ধারী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অশিক্ষিত গ্রাম্য মহিলাদের— যাঁরা ভোট কক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। আপনার হয়তো মনে হবে এঁরা গণতন্ত্রের কী বোঝেন? এঁরা তো চূড়ান্ত অশিক্ষিত। শিক্ষা ছাড়া গণতন্ত্রের মূল্য কোথায়— এসব হয়তো ভাববেন আপনি। কিন্তু ভোটের ফল বেরুতে দিন। তখন আপনি দেখবেন, আসলে এঁরা সব বোঝেন। নিজেদের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির, আশা-আকাঙ্ক্ষার সব হিসেব এঁরা এক একটি বোতাম টিপে ঠিক বুঝিয়ে দেন। গ্রামীণ ভারতের নির্বাচনের এটাই হলো বাস্তব সত্য। তাই দলে দলে মানুষ এখানে ভোট দেন। গণতান্ত্রিক ভারতের নরনারায়ণ এঁরাই। আমাদের গণতন্ত্রে একটি নিরক্ষর দরিদ্র বৃদ্ধার ভোটের যা দাম, একজন বিদ্বান নাগরিকের ভোটেরও তাই দাম। এই একটি ক্ষেত্রে একটি দিনে সবাই সমান। আর সবাইকে সমান করে দেওয়ার কাজটি নির্বাচন কমিশনের ডাণ্ডা মেরে আপনি সম্পূর্ণ করবেন।

সকাল সাতটায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়, কিন্তু নিজ নিজ এপিক নিয়ে দেখবেন গ্রামের পুরুষ-মহিলারা লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন ঘণ্টা খানেক আগেই। সেই যে লাইন শুরু হলো তা চলবে সারাদিন।

মেশিনের সাহায্যে ভোট দ্রুত হয়, তাই যা রক্ষে। গ্রামীণ ভারতই ভারতের গণতন্ত্রের গৌরব বহন করছে। এখানে ভোটদানের শতকরা হার ৮৫ থেকে ৮৮ শতাংশ। কোথাও কোথাও ৯০ শতাংশ। নগরে মহানগরে তা বেশ কম। শহুরে শিক্ষিত ভোটারের মনে হয় ভোট দিয়ে কী হবে? এ ব্যাপারে তাঁরা উদাসীন। কিন্তু গ্রামীণ ভারত তা নয়। ভারত বাস করে গ্রামে, বলেছিলেন গান্ধীজী। এখনো দেশ বা রাজ্যের সরকার গঠনে শহুরে নাগরিকদের চেয়ে গ্রামীণ ভারতের ভূমিকা বেশি। আগেই বলেছি আমাদের দেশে এক একটি সাধারণ নির্বাচন উৎসবের চেহারা নেয়। আর একজন প্রিসাইডিং অফিসার তাঁর বুথে গিয়ে এই উৎসবকে একেবারে কাছ থেকে দেখেন। শুধু দেখার মতো রসিক মন চাই।

শুধু বুথে নয়, DCRC (Distribution centre and Receiving centre) কেন্দ্রগুলিতেও জমে ওঠে উৎসব। ভোটের আগের দিন (P-1 Day) সকালেই ভোট কর্মীদের যাত্রা ওই কেন্দ্রগুলির দিকে। সেখানে পৌঁছানো মাত্র আপনি এক বিরাট ব্যস্ততার, কোলাহলের আর ছোটোখাটো জনসমাগমের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। মাইকের চিৎকার, হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি, লাইন দিয়ে ভোট সামগ্রী নেওয়ার ভিড়, তা সংগ্রহ করার পর বিরাট প্যান্ডেলের কোনো এক জায়গায় বসে সেগুলো মিলিয়ে দেখে নেওয়ার ব্যস্ততা। হ্যাঁ, ইতিমধ্যেই আপনি জোট বেঁধেছেন আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত আরও তিনজন মানুষের সঙ্গে। সকলের উদ্দেশ্য ঠিকঠাকভাবে ভোটটা পার করে দিয়ে আসা। সবকিছু মেলানোর পর প্রিসাইডিং অফিসার দৌড়বেন পুলিশ নিতে। পুলিশ নেওয়ার পর গাড়ি। ইতিমধ্যেই আপনি জেনে গিয়েছেন কোথায় আপনার বুথ, বুথ নম্বর, সেখানে ভোটার কত এইসব। জেনে যাবেন কে আপনার সেক্টর অফিসার, তাঁর কয়েকবার ফোন পেয়ে যাবেন আপনি। তারপর গাড়িতে করে পুলিশ নিয়ে আপনি আপনার বুথে যাবেন। তা হতে পারে সামনেই, কিংবা বেশ দূরে। হতে পারে ৫০-৬০ কিলোমিটার বা তারও বেশি দূরে। এই যাত্রা থেকেই আপনাকে আনন্দ খুঁজে বার করে নিতে হবে। সন্ধ্যার আগেই আপনি গিয়ে পড়বেন সম্পূর্ণ অপরিচিত, কোনোদিন না দেখা এক গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। হয়তো তা একেবারেই অজগ্রাম। সেরকম সম্ভাবনাই বেশি। সেখানে পৌঁছে আপনি দেখবেন আপনার সুরক্ষায় ও শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণের জন্য সেখানে আগে থেকেই হাজির কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। তাঁদের দেখে আপনি মনে বল পাবেন। সেখানকার নলকূপের জলে হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে সঙ্গে থাকা হালকা টিফিন খেয়ে নিয়ে আপনি যতটা পারেন কাগজপত্র গোছাতে শুরু করুন। কারণ এটা না হলে রাস্তায় অল্প হাঁটাহাঁটিতেও আপনি শান্তি পাবেন না। রাস্তায় যখন বেরোবেন তখন আকাশে অনেক তারা, রাত্রি নেমেছে। এই পরিবেশে অপরিচিত জায়গায় হাঁটতে আপনার ভালোই লাগবে। রাতের খাবার দিয়ে যাবেন গ্রামের মহিলারা। এঁদের হাতের রান্না আপনি তৃপ্তি করে খাবেন। তারপর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেঝেয় অথবা বেঞ্চ থাকলে কয়েকটা পাশাপাশি সাজিয়ে আপনি বিছানা তৈরি করুন। ঘুমানোর চেষ্টা করুন। কিন্তু ঘুম আসতে চাইবে না। পরের দিন কী কী কাজ আছে তার নানা চিন্তা আপনার মাথায় আসতে পারে। সেকারণেই প্রায় বিনিদ্র রাত কাটাবেন আপনি। রাত্রে একবার বাইরে আসুন। দেখুন গ্রামের রাত্রির আকাশ। দেখুন তারাদের ঝিকিমিকি, মাথার উপরে উজ্জ্বল চাঁদ। আর হ্যাঁ, তারই মাঝে আপনি দেখবেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের। তাঁরা দুজন সশস্ত্র, ছাদের উপরে দৃপ্ত ভঙ্গিতে পায়চারি করছেন। একবার এদিক, একবার ওদিক। ওঁরা নিদ্রাহীন।

এরপর ভোটের দিন। একেবারে ব্রাহ্ম মুহূর্তে ভোর সাড়ে চারটে-পাঁচটার মধ্যে আপনাকে যেনতেন ভাবে স্নান সেরে নিতে হবে। তারপর প্রস্তুত হয়ে পড়ুন পুরোপুরি। সাড়ে পাঁচটায় শুরু হবে মক পোল। এজেন্টরা তার আগেই চলে আসবে। তাদের নিয়ে আপনার বহু কাজ। ব্যাস, আপনি কাজে ডুবে গেলেন। সাতটার আগেই মেশিন সিল। ঠিক সাতটায় ভোট শুরু। সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত চলবে ভোট গ্রহণ। ভোট দিতে আসবেন যাঁরা তাঁদের দেখুন আপনি। আপনার ভালো লাগবে। মায়েরা আসবেন ছেলে কোলে নিয়ে। কৃষক-মজুরেরা আসবেন নিতান্তই সাধারণ বেশভুষায়, অশক্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আসবেন বহু কষ্টে, কেউ-বা হাতে লাঠি নিয়ে, যুবক ভাইয়েরা আসবেন দৃপ্ত পদভঙ্গিতে, যুবতী মেয়েরা আসবেন সলজ্জ হাসিতে। এঁদের দেখুন, আর আপনার হরেক রকমের ফর্ম ভরতে থাকুন; বিভিন্ন রকমের খাম আলাদা করতে থাকুন। দু' ঘণ্টা ছাড়া ছাড়া রিপোর্ট পাঠাতে থাকুন। কত পোল হলো; তার মধ্যে কত পুরুষ, কত মহিলা। তবে ভোট চলতে চলতেই আপনার কাছে বারবার প্রশ্ন আসবে—

—'ভোটটা কুথায় দিব? বুঝতে পারছি নাই। কোনটা টিপব?'

অশক্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বারবার এরকম প্রশ্নে আপনি বিরক্ত হয়ে পড়বেন। আপনাকে বোঝাতে হবে। বুঝিয়ে বুঝিয়ে একসময় আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। এক একবার পিঁ— আওয়াজ হবে আর আপনি হাঁপ ছেড়ে বাঁচবেন। কেউ কেউ নিজেদের এপিক মেশিনের কোথায় ঢোকাবেন তার জায়গা খুঁজবেন। কেউ কেউ গোটা মেশিন, ভিভিপ্যাট নাড়াচাড়া করবেন। কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পাবেন না কীভাবে ভোট দিতে হয়। আপনি ভোট কক্ষের কাছে গিয়ে তাঁদের বোঝাতে পারবেন না। কারণ সিসি টিভি-র অদৃশ্য চোখ হয়তো আপনাকে নজরে রেখেছে। শেষ পর্যন্ত ওই ভোটার নীচের নোটার বোতাম টিপবেন। আপনি বলবেন— 'যাক বাঁচা গেছ'। এভাবে নোটা বেশ কিছু ভোট পাবে। নিয়ম বলবে নোটায় যাঁরা ভোট দিলেন তাঁদের কোনো প্রার্থীকেই পছন্দ নয়। কিন্তু আপনি বুঝবেন আসল কথা। এসব করতে করতেই সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা বেজে যাবে। আপনার ভোট শেষ। মেশিনের ক্লোজ বোতাম টিপুন। আরও অনেক কাগজপত্র তৈরি করে আপনি কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাহারায় নিরাপদে রিসিভিং সেন্টারে চলে আসবেন। রিসিভিং-এর কর্মচারীদের সঙ্গে আপনার বিরোধ বাঁধবে। আপনাকে যেভাবে জমা দিতে বলা হয়েছিল ট্রেনিংয়ের সময়, এখন তাঁরা এক অন্য ফরম্যাট নিয়ে বসে আছেন। শেষ পর্যন্ত আপনাকে ওদের মতো করেই জমা দিতে হবে। শেষ সময়েও সবকিছু আবার গোছাতে গিয়ে আপনাকে গলদঘর্ম হতে হবে। আপনি সবকিছু জমা দেবেন এবং রিলিজ পাবেন। তারপর ফিরে আসার বাস দেখুন। ভোর নাগাদ বা হয়তো সকালে আপনি ক্লান্ত শরীর নিয়ে বাড়ি ফিরবেন।

আপনি তো বাড়ি ফিরলেন। কিন্তু একবার কেন্দ্রীয় জওয়ানদের কথা ভাবুন। ওঁরা অনেকে যেমন স্ট্রং রুমের পাহারায় ব্যস্ত হয়ে পড়বেন, তেমনি অনেকে চলে যাবেন অন্য এক ভোট-কেন্দ্রে। হিংসায় দীর্ণ আমাদের রাজ্যে শান্তিতে ভোট করানোর জন্য ওঁরা এসেছেন দূরদূরান্ত থকে। ওঁদের কোনো অভিযোগ নেই, কারো বিরুদ্ধে কোনো রাগ নেই, বিদ্বেষ নেই। ঘরে এসে স্নান সেরে লম্বা একটা ঘুম দেওয়ার পর চায়ের কাপ হাতে নিয়ে আপনি একবার অন্তত এই নিরলস অক্লান্ত জওয়ানদের অভিবাদন জানান। ▯

পুতুল তৈরির খেলা থেকে গিনেস বুকের রেকর্ডে

কৌশিক রায়

মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার সংস্কৃতির ও কৃষ্টিরও অন্যতম প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে পোড়ামাটি, ধাতু, কাঠের মতো বিভিন্ন উপাদানে বানানো নানান আঙ্গিকের পুতুল। সিন্ধু উপত্যকার অন্তর্গত চান্হুদারো ও কালিবাংগান, চৈনিক সভ্যতার হোয়াংহো নদীর অববাহিকা, মিশরীয় সভ্যতার অন্তর্গত কারনাক আর এল-বাওয়িতি, গ্রিসের এথেন্স ও স্পার্তা, মেসোপোটেমীয়- বাবিলোনীয় সভ্যতার অন্তর্গত এরিদু, লাগাশ, নিনেভে-র মতো স্থানগুলি থেকে পাওয়া বিভিন্ন পুতুল দেখে আমরা সেই সভ্যতাগুলির জনজীবনধারা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পেতে পারি। বিভিন্ন ধরনের পুতুল তৈরিতে যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন হয়। সেটা আমরা বাঁকুড়ার ডোকরা

পুতুল, তেলেঙ্গানার ধাতুনির্মিত পুতুল এবং কৃষ্ণনগরের টেরাকোটা পুতুলের সৌন্দর্য-সৌষ্ঠবকে দেখেই বুঝতে পারি। তবে, এই পুতুল তৈরিতে বিশ্বখ্যাতির অধিকারিণী হয়ে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এ নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছেন উত্তর প্রদেশের রাজধানী শহর লক্ষ্ণৌয়ের নিবাসিনী ২২ বছরের এক প্রতিভাময়ী যুবতী শিবালি জোহ্‌রি শ্রীবাস্তব।

কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কৃতী শিক্ষার্থী শিবালি শ্রীবস্তব। পড়াশোনার পাশাপাশি মা কবিতা এবং বাবা অনিলের সাহায্যে হায়দরাবাদে একটি শিশু প্রদর্শনীতে কাপড়, কাগজ (জাপানি ওরিগামি পদ্ধতি মাফিক) এবং ছোটো পিন বা 'ক্যুইল'-এর সাহায্যে ২২০০ পুতুল বানিয়ে সবাইকে চমৎকৃত করে ছিলেন শিবালি। এর সঙ্গে গিনেস বুকের কাছ থেকে সাফল্যের পদক প্রাপ্তিও হলো শিবালির। এই সাফল্য আরও এগিয়ে যাওয়ার সাহস জোগালো শিবালির মনে। ক্যুইল দিয়ে ফুলের আকারে ৭০১১টি পুতুল বানালেন তিনি। আরও একবার গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এর কাছ থেকে স্বীকৃতিমূলক পদক পেলেন শিবালি। এরপরে, আরও একটি প্রদর্শনীতে দু' দিনের মধ্যে ২১১১টি পুতুল বানিয়ে সবাইকে আবার চমকে দিলেন শিবালি। এভাবেই গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এর কাছ থেকে ১২টি শংসাপত্র লাভ করেছেন উদ্যমী শিবালি তাঁর পুতুল তৈরির মুন্সীয়ানার জন্য।

২০১৮ সালের ২৩ জুন তারিখটা শিবালির কাছে সত্যিই মনে রাখার মতো। ৯ মাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করার ফসল হিসেবে ওইদিন শিবালি আর তাঁর মা ৩৫০১টি কাগজ দিয়ে তৈরি তিমি-পুতুলের (ওরিগামি) একটি প্রদর্শনী করে দেখান। এরপর শিবালি ওরিগামি পদ্ধতি অনুযায়ী ২১০০টি কাগজের পেঙ্গুইন পাখির মডেল তৈরি করে দেখিয়েছিলেন।

ছোটোবেলাতে অবশ্য রং-তুলি-মোম-পেন্সিল দিয়ে পাতার পর পাতা ছবি আঁকতে ভালোবাসতেন শিবালি শ্রীবাস্তব। এরপর হায়দরাবাদে পল্লবী মডেল স্কুলে পড়বার সময় থেকেই জাপানি পেপার কাটিং বা 'ওরিগামি'তে রপ্ত হয়ে বিভিন্ন ধরনের পুতুল বানানো শুরু করেন শিবালি। আট ঘণ্টার মধ্যে যে কোনও বিষয়ের বা ব্যক্তির ছবি আঁকার ক্ষমতা আছে তাঁর। এরপরে গীতাঞ্জলি সিনিয়র স্কুল এবং হায়দরাবাদের গীতম ডিম্‌ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্সের পাঠ নেওয়ার সময়ে পুতুল তৈরিতে আরও বেশি করে মন দিয়েছিলেন শিবালি। মন দিয়ে পড়তেন বিভিন্ন দেশের পুতুল তৈরির ইতিহাস। সেইজন্য এক ক্যালেন্ডার বছরে সাত-সাতটি গিনেস বিশ্ব রেকর্ড-এর শংসাপত্র পেতে তেমন কোনও অসুবিধা হয়নি শিবালির।

২০১৯ সালের ১৯ এপ্রিল আবারও একটি বিশ্বরেকর্ড করলেন শিবালি শ্রীবাস্তব। ওইদিন, ওরিগামির সাহায্যে ৬০০১টি তিমি মাছের পুতুল, ২৫টি পেঙ্গুইন পাখি এবং ১৪৬১টি গাছের পাতা বানিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ওই বছরই শিশু দিবসে তিনি একটি প্রদর্শনীতে ওরিগামির সাহায্যে ৯২০০টি মাছ এবং ২২০০টি ক্যুইল পুতুল বানিয়ে দেখান। আবার ওই বছরের ১৯ ডিসেম্বর, ওরিগামি পেপার কাটিংয়ের সাহায্যে ১৯৯৩টি মেপল গাছের পাতা তৈরি করে দেখান শিবালি।

কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি পাওয়ার পর বর্তমানে শিবালি জোহরি শ্রীবাস্তব আইবিএম-এর অ্যাসোসিয়েট সিস্টেমস ইঞ্জিনিয়ার। তবে সাইবার দুনিয়াতে দক্ষতা দেখানোর পাশাপাশি পুতুল তৈরিতেও বিশ্বখ্যাতি অর্জন করতে অসুবিধা হয়নি শিবালির। কল্পনা ও বাস্তব জগতের মধ্যে অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে তাঁর ব্যতিক্রমী অক্লান্ত প্রতিভা। ▫

চারটি দামি উপদেশ

এক জমিদার ছিলেন। তিনি খুব ধার্মিক ও স্বাভিমানী ছিলেন। একদিন এক পণ্ডিত তাঁর বাড়ি এলেন। জমিদার তাঁকে খুব সমাদর করে বসালেন এবং অনুরোধ করলেন কিছু ভালো উপদেশ দেবার জন্য। পণ্ডিত বলললেন, তিনি উপদেশ দেবেন কিন্তু তার বিনিময়ে তাকে মূল্য দিতে হবে। এক একটি উপদেশের জন্য একশো টাকা দিতে হবে তাকে। জমিদার রাজি হলেন। পণ্ডিত বললেন, মানুষ যদি বড়ো পদে উন্নীত হয় তাহলে তাকে বড়ো বলেই মানা উচিত, ছোটো মনে করা ঠিক নয়। জমিদার তার নায়েবকে বললেন পণ্ডিতকে একশো টাকা দিতে। নায়েব একশো টাকা দিয়ে দিলেন। জমিদার বললেন আর কিছু বলুন। পণ্ডিত বললেন, অন্যের দোষ প্রকাশ করা উচিত নয়। জমিদারের কথায় নায়েব আবার একশো টাকা দিলেন। জমিদার বললেন আরও কিছু বলুন। পণ্ডিত বললেন, যে কাজ চাকরের দ্বারা করানো যায়, সেই কাজে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। নায়েব এই কথার জন্যও একশো টাকা দিলেন। জমিদার বললেন, আর একটা উপদেশ দিন। পণ্ডিত বললেন, একবার যেখান সম্মান নষ্ট হয়ে যায় সেখান থাকতে নেই। পণ্ডিত টাকা নিয়ে চলে গেলেন।

জমিদার চারটি উপদেশ খুব ভালোভাবে মনে রাখলেন আর বাড়ির নানা জায়গায় তা ভালো করে লিখে রাখলেন। কিছুদিন পর জমিদারের জমিদারি চলে গেল। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে, তাকে স্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে হলো। তার সঙ্গে তার নায়েবও ছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে তারা অন্য রাজ্যে প্রবেশ করলেন। জমিদার নায়েবকে খাবার আনার জন্য রাজধানীতে পাঠালেন। ঘটনাচক্রে আগেরদিন সেই রাজ্যের রাজার মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর কোনো উত্তরাধিকার না থাকায় সেখানকার লোকেরা ঠিক করেছিল যে, পরদিন যে ব্যক্তি প্রথম রাজধানীতে প্রবেশ করবে তাকেই তারা সিংহাসনে বসাবে। নায়েব রাজধানীতে প্রবেশ করতেই লোকেরা তাকে হাতির পিঠে চাপিয়ে ধুমধাম সহকারে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেল এবং রাজ্যাভিষেক করে রাজা হিসেবে বরণ করে নিল।

জমিদার নায়েবের অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসেছিলেন। অনেক সময় পেরিয়ে যাওয়ায় নিজেই নায়েবকে খুঁজতে রাজধানীতে এলেন। এসে জানতে পারলেন যে নায়েবকে এই রাজ্যের রাজা করা হয়েছে। জমিদার তখন রাজপ্রসাদে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলেন। নায়েব তাকে সমস্ত কথা জানালেন। জমিদারের পণ্ডিতের প্রথম উপদেশের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি নায়েবকে প্রণাম করলেন। রাজা তাকে মন্ত্রী করে নিজের কাছেই রাখলেন।

রাজার ঘোড়াশালের অধ্যক্ষের সঙ্গে রানির অবৈধ সম্পর্ক ছিল। একদিন হঠাৎ জমিদার রানিকে অধ্যক্ষের সঙ্গে বিছানায় দেখে ফেললেন। দুজনেই তখন নিদ্রামগ্ন। জমিদারের পণ্ডিতের উপদেশের কথা মনে হলো। জমিদার নিজের গায়ের শালটি টাঙ্গিয়ে দিয়ে ওদের আড়াল করে দিলেন। রানির ঘুম ভাঙলে শালটি চিনতে পারল। সে মনে মনে ভাবল মন্ত্রী তো রাজাকে সব বলে দেবে। এমন কিছু করতে হবে যাতে মন্ত্রীই ফাঁদে পড়ে যায়। এই ভেবে রানি শালটি রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল কাল রাতে আপনার মন্ত্রী অসৎ উদ্দেশ্যে আমার ঘরে এসেছিল। আমি দেখে ফেলায় পালিয়ে যাবার সময় তার শালটা কেড়ে নিয়েছি। রাজা শাল দেখে চিনতে পারলেন। রানির সাজানো মিথ্যে কথায় রাজা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে জমিদারকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করলেন।

পরদিন রাজা জমিদারকে কসাইয়ের কাছ থেকে মাংস কিনে আনতে বললেন। রাজা কসাইকে আগেই বলে রেখেছিলেন সকালে যে লোক তোমার কাছে মাংস কিনতে আসবে তাকে মেরে ফেলতে হবে। জমিদার অবাক হয়ে গেলেন রাজামশাই তো জানেন তিনি কখনো মাংস স্পর্শ করেন না। এতে নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। তার পণ্ডিতের উপদেশের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি নিজে না গিয়ে চাকরকে পাঠালেন। কসাই তাকে হত্যা করল। এদিকে রাজার গুপ্তচরেরা ঘোড়াশালের অধ্যক্ষের সঙ্গে রানির অবৈধ সম্পর্কের কথা রাজাকে জানিয়ে দিল। রাজার তখন খুব অনুতাপ হলো যে, রানির কথায় বিশ্বাসী মন্ত্রীকে হারালাম। পরে জানতে পারলেন যে, মন্ত্রী বেঁচে আছেন। গোপনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজা জানতে চাইলেন যে, আপনার শাল রানির কাছে গেল কী করে? জমিদার সব কথা বলে বললেন পণ্ডিতের উপদেশ অনুসারে রানির অন্যায়ের কথা আপনাকে বলিনি। রাজা তখন জমিদারকেপুনরায় মন্ত্রীপদ গ্রহণ করার অনুরোধ করলেন। জমিদার পণ্ডিতের শেষ উপদেশ স্মরণ করে বললেন, আমি আর এখানে থাকব না। আমাকে আটকাবার চেষ্টা করবেন না। জমিদার অন্য কোথাও চলে গেলেন।

গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের সাধুসন্ত

আদি শঙ্করাচার্য

৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে কেরলের কালাডি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল থেকেই প্রখর মেধাবী ছিলেন। আট বছর বয়সে চারটি বেদ কণ্ঠস্থ করেন। তারপরই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি ভারতীয় অদ্বৈত বেদান্ত শাখাটির সুসংহত রূপ দেন। সারা ভারত পর্যটন করে তিনি তাঁর দার্শনিক মত প্রচার করেন। ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করে বেদান্ত দর্শনের ঐতিহাসিক বিকাশ, পুনর্জাগরণ ও প্রসার করেন। তিনি চারটি মঠের দায়িত্ব দেন চারজন শিষ্যকে। তারা হলেন– সুরেশ্বরাচার্য, হস্তামলকাচার্য, পদ্মপাদাচার্য ও তোটকাচার্য। তিনি দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। ৮২০ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৩২ বছর বয়সে মহাপ্রয়াণ করেন।

জানো কি?

প্রাচীন ভারতের ষোড়শ মহাজনপদ ও রাজধানী

● কাশী– বারাণসী ● অবন্তী–উত্তরে উজ্জয়নী, দক্ষিণে মাহিষ্মতী
● গান্ধার-- তক্ষশীলা
● চেদি–শুকতিমতী ● কুরু– ইন্দ্রপ্রস্থ
● কোশল–শ্রাবস্তী ● অঙ্গ–চম্পা
● কম্বোজ--রাজপুর ● অশ্মক --পোটানা/পোটালি ● সুরসেন–মথুরা
● পাঞ্চাল--উত্তরে অহিছত্র, দক্ষিণে কাম্পিল্য ●বৃজি–বৈশালী
● বৎস–কৌশাম্বী ● মৎস্য–বিরাটনগর
● মল্ল– কুশীনারা/পাবা
● মগধ– রাজগৃহ/পাটলীপুত্র

ভালো কথা

পাখির বাসা

একদিন দেখি একটি টুনটুনি আমাদের বাইরের বারন্দায় খড়কুটো দিয়ে বাসা তৈরি করছে। বাবা দেখতে পেয়ে বাসাটা ভেঙে দিতে চাইল। আমি বাবাকে বললাম, না বাবা ভেঙো না। বাবা বলল ঠিক আছে। কদিন পরে দেখি দুটো ডিম পেড়েছে। বাসার বাইরে শুধু মুখটা বের করে রেখে পাখিটা ডিমে তা দিত। আমি আর ভাই তাই দেখে খুব আনন্দ পেতাম। একদিন দেখি ডিম ফুটে বাচ্চা হয়েছে। ছানাদুটো মুখ হাঁ করে শুধু চিঁ চিঁ করে। ওদের মা মুখে করে খাবার এনে খাওয়ায়। ধীরে ধীরে ছানাদুটো বড়ো হয়ে মায়ের সঙ্গে উড়ে গেল। বাবা তখন বাসাটা ভেঙে দিতে চাইল। আমি বললাম, না বাবা থাক। কদিন পরে দেখি পাখিটা আবার এসে বাসাটা সারাই করছে। তারপর দুটো ডিম পাড়ল। একদিন খেলতে খেলতে ভাইয়ের হাত থেকে গদাটা পাখির বাসায় লেগে ডিমদুটো মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল। তাই দেখে মা টুনটুনি কিচমিচ করতে করতে চলেগেল। দুঃখে আমারও চোখে জল এসে গেল।

আরাত্রিকা মিশ্র, পঞ্চমশ্রেণী, জিলা পাবলিক স্কুল, তমলুক।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) মি গ রা ল প

(২) না ধ ত্য সা সা

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) বি ন ম শ হা জ্ঞা কা

(২) ভ য় ঙ্গ কা নি রী ম

১৯ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর

(১) অক্ষরবিন্যাস (২) আলোকতরঙ্গ

১৯ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর

(১) আজন্মলালিত (২) আড়ংধোলাই

উত্তরদাতার নাম

(১) শুভ চৌহান, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উঃ দিঃ। (২) আকাশ বাসফোর, খরমুজাঘাট, রায়গঞ্জ, উঃ দিঃ। (৩) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা,কলকাতা-৪৯ (৪) আকাশ কুমার, বাগমুণ্ডি, পুরুলিয়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ৭।।

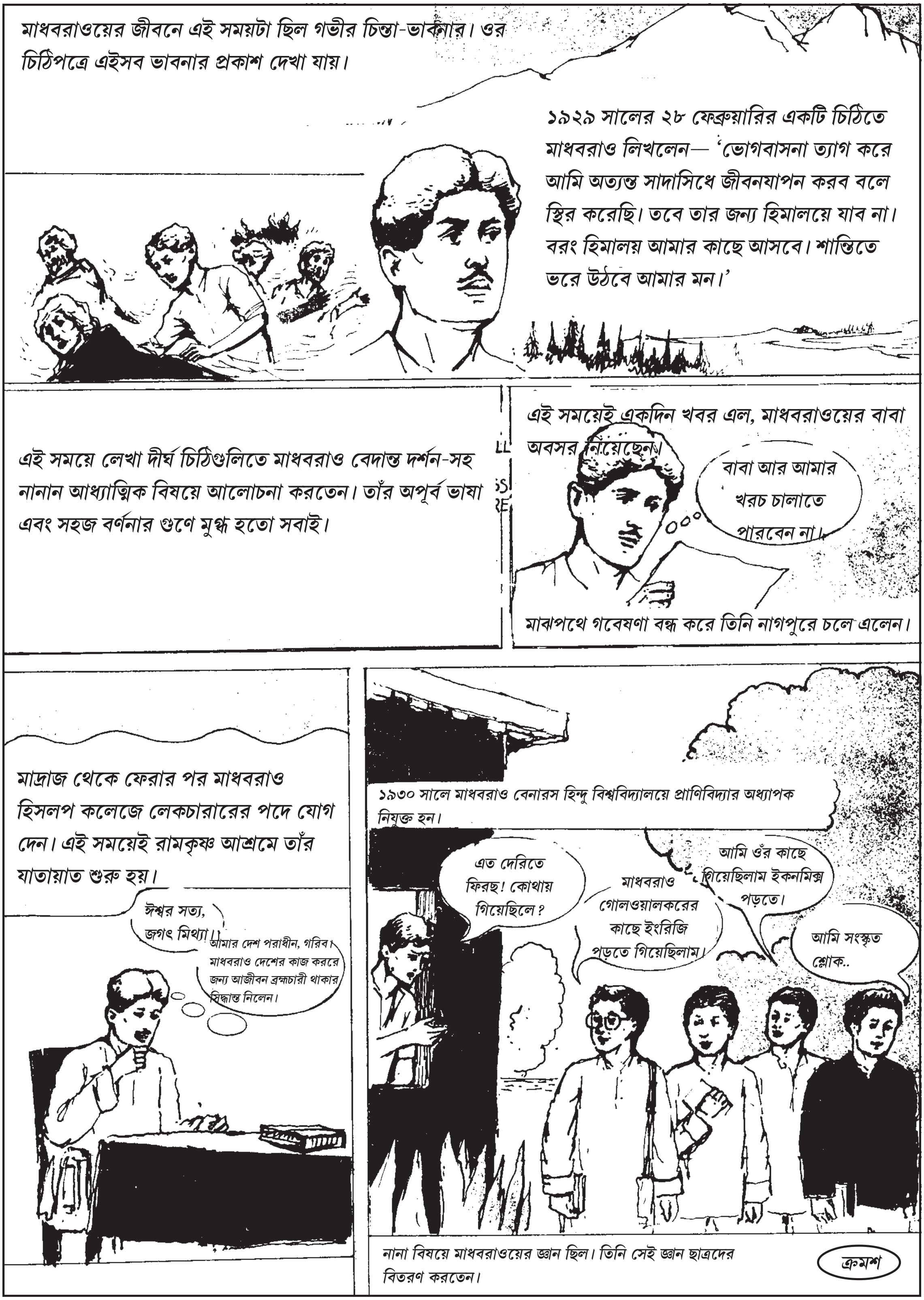

হিন্দু নারীবাদ ও পৌরাণিক পঞ্চকন্যা

স্মৃতিলেখা চক্রবর্তী

সভ্যতা চিরকালই নারী নির্ভর, অসভ্যতাও তাই। কোনো জাতি বা দেশ কতটা সভ্য সেটা বোঝা যায়, তারা মেয়েদের কতটা সম্মান দেয় সেটা বিচার করে। যে দেশে নারীর সম্মান নেই, সেই দেশ খুব একটা নিরাপদ নয়। তবে যুগের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার সংজ্ঞা পালটায়, সীমাও পালটায়। পঞ্চকন্যা, পঞ্চসতীর লীলাভূমি যে ভারতবর্ষ, যেখানে নারীর জীবন ছিল অবাধ, সেই দেশেই নারীর জীবন হয়ে উঠল বিপদসংকুল। আবার যেই ইউরোপে ছুতোনাতায় মেয়েদেরকে অপবিত্র আখ্যা দিয়ে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হতো, মূর্তি পুজো করা পৌত্তলিক মেয়েদের ডাইনি আখ্যা দিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারত যে মহাদেশের পাদ্রীরা, সেই ইউরোপেরই এখন দিকে দিকে মাথা তুলেছে নারীবাদ।

পাশ্চাত্যে নারী মুক্তির এই আন্দোলন শুরু হয় ১৭৯২ সালে, মেরি উলস্টোনক্রাফটের হাত ধরে। সে সময়ে নারীবাদ ছিল সমান কাজে মেয়েদের সমান মজুরি আর ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলন। এটা ছিল প্রথম তরঙ্গ, এরপর সিমোন দি বোভোয়া, বেটি ফ্রিডান, গ্লোরিয়া স্টাইনেমদের সুবাদে বেড়ে ওঠে দ্বিতীয় তরঙ্গ। এর লক্ষ্য মূলত নারীর ক্ষমতায়ন হলেও এই স্তরে ক্ষমতাকে নারীর ন্যায্য অধিকার হিসেবেই দেখা হতো। তাই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে শক্তিশালী না হলে মেয়েদের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা সম্ভব নয়, এই চেতনা দিকে দিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর্থিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতায়নে মেয়েদের অগ্রগতির পর আবির্ভাব হয় তৃতীয় তরঙ্গের। এর লক্ষ্য ছিল মেয়েদের ইচ্ছাপূরণকে নারীর অধিকার হিসেবে বৈধতা দেওয়া। নারীর যাবতীয় ইচ্ছা, সেটা গর্ভপাতই হোক বা ভ্রূণহত্যা, পরকীয়া হোক বা পরিবার ত্যাগ; পূর্ণ করার পথে সমস্ত সামাজিক ও নৈতিক বাধাকে দূর করতেই এই তরঙ্গ সচেষ্ট। বর্তমানে চলছে নারীবাদের চতুর্থ তরঙ্গ। এই তরঙ্গ থেকে শুরু হয় নারীবাদকে প্রান্তিকবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার প্রচেষ্টা। অর্থাৎ তৃতীয় লিঙ্গ, সংখ্যালঘু, উপজাতি ইত্যাদি যেখানে যত প্রান্তিক নারী ও পুরুষ আছে, তারা সকলেই নারীবাদের ভাই। কারণ নারীরাও প্রান্তিক। অতএব সমস্ত প্রান্তিকেরা এক হয়ে নিজেদের অধিকারের জন্য একসঙ্গে আন্দোলন করলে অধিকার আদায় সহজ হবে।

এই চার তরঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মিল হলো এরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ভাবে ‘অধিকার’-এর কথা বলে। ‘অধিকার’ শব্দটা যে কোনো আন্দোলনের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। অধিকার মানে প্রাপ্য, ন্যায্য পাওনা কড়ায়গণ্ডায় বুঝে

ফঃ ৬

নিতে পারলেই আন্দোলন সফল। আর গত কয়েক দশক ধরে বাঙ্গালির রাজনীতি তো পাওয়া আর পাইয়ে দেওয়ার উপর নির্ভর। আর সেজন্যই বাঙ্গলার ক্ষেত্রে অধিকার শব্দটার ধার ও ভার এত বেশি। তবে প্রাচীন ভারতে অধিকার শব্দটা আর একটা অন্য অর্থেও ব্যবহার হতো। যে দায়িত্ব পালনে যিনি সমর্থ, শুধু সেটুকুতেই তাঁর অধিকার। তাই যিনি যে দায়িত্ব পালন করতে সবচেয়ে ভালো পারবেন, কেবল তিনিই তার অধিকারী হবেন। অর্থাৎ অধিকারের যোগ ছিল কর্তব্যের সঙ্গে আজ দীর্ঘদিনের অপব্যবহারে অধিকারের মানে দাঁড়িয়েছে দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে শুধুই পাওনা-গণ্ডার হিসেব নিকেশ। কোনো শব্দের ব্যবহার এইভাবে উলটে যাওয়া অনেক কিছুর ইঙ্গিত দেয়। ভারতীয় মানসিকতা ভিতরে ভিতরে কতখানি বদলে গেছে, তার কিছু আভাস এখান থেকেই পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতে নারীবাদ ছিল না ঠিকই কিন্তু নারীত্ব ছিল পূর্ণমাত্রায়। নারীত্ব মানে নরম-কোমল মাধবীলতা নয়; হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে নারীত্ব হলো পূর্ণতার প্রতীক। যার জীবন শুধুমাত্র একটি দিকেই বিকশিত, তাঁকে কোনোভাবেই পূর্ণ বলা যায় না। কিন্তু যাঁর কর্মকাণ্ড নানান দিকে ছড়িয়ে, তিনিই সম্পূর্ণ মানুষ। যে শুধুমাত্র পড়াশুনায় ভালো, এছাড়া অন্য কোনো প্রতিভা নেই, সে যতটা অসম্পূর্ণ; যে শুধুমাত্র ঘরের কাজ শিখেছে, আর কিছুই শেখেনি, সেও ঠিক ততটাই অসম্পূর্ণ। তাই ভারতীয় সভ্যতায় মেয়েদের সবকিছুই শেখানো হতো। জ্ঞানচর্চা যেমন বাধ্যতামূলক ছিল, সঙ্গে সঙ্গে তেমনই শিখতে হতো যুদ্ধবিদ্যা, সংগীত এবং নৃত্যকলা, রন্ধন শিল্প, সূচিশিল্প ইত্যাদি। প্রকৃতিগত ভাবে পুরুষের সঙ্গে নারীর অন্যতম পার্থক্যও এইখানে। পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি একমাত্রিক। কোনো একটা জিনিসে প্রচণ্ড মনোযোগ দিয়ে, সেটাতেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা পুরুষের সহজাত প্রবৃত্তি। নারীর মন একইসঙ্গে বহু কাজে অনায়াসে চলেফিরে বেড়াতে পারে। যে কারণে নারীকে চঞ্চলাও বলা হয়। এই চঞ্চল প্রকৃতিই নারীত্বকে সবল করেছে। কারণ নারীর দায়িত্ব বহুমুখী। আর সেই দায়িত্ব পালনে বহু রকম কাজে পারদর্শিতা থাকাটাও অত্যন্ত জরুরি।

নারীত্বের মধ্যেই প্রবল ব্যক্তিত্ব, বহুমুখী দায়িত্ব আর দৃঢ় চরিত্রকে কীভাবে ধারণ করতে হয়, তার আদর্শ উদাহরণ পঞ্চকন্যা— সতী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অরুন্ধতী। এঁদের জীবন বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে এঁরা কেউই শুধুমাত্র একটা কারণে বিখ্যাত নন। এদের প্রত্যেকের চরিত্রেই অনেকগুলো স্তর রয়েছে। প্রতিটি স্তরে আছে আলাদা আলাদা গুণ। অরুন্ধতী অসামান্য রূপসী ছিলেন, অসাধারণ স্তোত্র পাঠ করতেন, জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিল গভীর। ঋষি বশিষ্ঠের সঙ্গে তার প্রেমকাহিনি আজও কিংবদন্তী। এখনো বহু হিন্দুর মধ্যে বিয়ের সময় বর-কনেকে বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর যুগল নক্ষত্র দেখিয়ে থাকেন। বহুমুখী চরিত্র হিসেবে দময়ন্তীও কিছু কম যান না। বিদর্ভ রাজ্যের রাজকুমারী হিসেবে যুদ্ধবিদ্যা ভালোই শিখেছিলেন। রূপেরও খ্যাতি ছিল। ভক্তিসাধনা করেই নলরাজাকে লাভ করেন, সীমাহীন ত্যাগ ও ধৈর্যশক্তি দিয়ে নলরাজাকে আবার নিজের জীবনে ফিরিয়ে আনেন। কালিদাসের মহাকাব্য তাঁকে শুধু অমরই করেনি, একটা গোটা যুগ ধরে সমগ্র ভারতে নল-দময়ন্তীকে দম্পতিদের জন্য আদর্শ প্রেম বলে মানা হয়েছে। একইভাবে সাবিত্রী বুদ্ধিমত্তার জোরে যমরাজকে পরাজিত করে সত্যবানের প্রাণ ফিরিয়ে এনেছেন। সীতা বনবাসের সময় রামচন্দ্রের পাশে থেকেছেন আবার সেই রামচন্দ্রই যখন বারবার সীতার অগ্নিপরীক্ষা নিতে চেয়েছেন, তখন গর্ভবতী অবস্থাতেও রাজপ্রসাদের সমস্ত সুখ-আহ্লাদ ছেড়ে বাল্মীকির পর্ণ কুটিরে এসে উঠেছেন। তাঁর আত্মসম্মানবোধ ছিল এতটাই তীব্র। এই জন্যই তো স্বামী বিবেকানন্দ সীতাকে বলেছেন সমগ্র ভারতীয় নারীর আদর্শ।

এখানে লক্ষণীয়, এঁদের মধ্যে কেউই কিন্তু শত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নিজের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি, নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্য ভুলে যাননি। নারীবাদ মানে শুধু অধিকারের লড়াই, নারীত্ব কিন্তু দায়িত্ব ও অধিকারের সমন্বয়। কারণ অধিকার পান তিনিই যিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পঞ্চকন্যার এই নারীত্বের আদর্শই 'হিন্দু নারী' আন্দোলনের সম্পূর্ণ স্বদেশি একটি স্বতন্ত্র ভাবধারা গড়ে তুলতে পারে। নারীবাদ যেহেতু একটা আন্তর্জাতিক ও পাশ্চাত্য মতবাদ, তাই সেটার ঢেউ ভারতেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। নারীবাদ যখন থেকে চতুর্থ তরঙ্গে প্রবেশ করে অন্যান্য প্রান্তিকদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছে, তখন থেকে হিন্দু মেয়েদের পক্ষে এটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। প্রান্তিক কথার অর্থ হলো কোণঠাসা, বঞ্চিত, নিপীড়িত। চতুর্থ তরঙ্গের বক্তব্য অনুযায়ী ভারতে নারীরা যেমন নিপীড়িত, সংখ্যালঘু অর্থাৎ দেশের দ্বিতীয় সংখ্যাগুরুরাও নাকি একইরকম নিপীড়িত। অতএব সংখ্যালঘুদের অধিকারের লড়াই নারীবাদীদেরকেই লড়তে হবে। এই কারণেই তিন তালাকের বিরুদ্ধে এদেশে আইন তৈরি হলে নারীবাদীরাই তার বিরুদ্ধে পথে নামেন, মুসলমান নারীর সুরক্ষায় বিল পাশ হলে নারীবাদীরাই বিরোধিতা করেন কিন্তু সংখ্যালঘুদের হাতে হিন্দু মেয়েরা অত্যাচারিত, ধর্ষিত, লাভ জেহাদ বা পাচারের শিকার হলে নারীবাদীরা আর মুখ খোলেন না। এঁদের এই নীরবতা যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ। আমাদের বুঝে নিতে হবে, আরও অনেক কিছুর মতো ভারতের নারীবাদেরও নিয়ন্ত্রণ আর ভারতীয় মানসিকতায় নেই। কিন্তু ভারতের প্রশাসনিক নীতি-নিয়ম, আইনি পরিকাঠামো ইত্যাদি বহু জিনিসের উপর নারীবাদীদের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ আছে। এই বিপুল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে যে কোনোদিন যে কোনোভাবে আমাদেরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে পারে। সেটা রুখতেই আমাদের পালটা আন্দোলন চাই। পশ্চিমি নারীবাদের উত্তরে হিন্দু নারী আন্দোলন। সিমোন বোভয়া, গ্লোরিয়া স্টাইনেমের তত্ত্ব নয়, চাই পঞ্চসতীর আদর্শের আধুনিক সংস্কার। দরকার অধিকার ও কর্তব্যের সঠিক সমন্বয়। বহুমুখী প্রতিভার বিকাশই ভারতীয় নারীর প্রকৃত পরিচয়। ❑

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ ধর্মপুরুষার্থ ও শিক্ষা

ইন্দুমতী কাটদরে

শিক্ষার প্রয়োজন

শিক্ষা সমাজকে ধর্ম শেখায় এ কথা যদি সত্য হয় তবে এই কথাকে কীভাবে প্রয়োগ করা যায় তার পদ্ধতি কী হবে তার জন্য চিন্তাভাবনা করা দরকার। এই চিন্তাভাবনা কে করবে এবং উদ্যোগ কে নেবে এটাও সমস্যা। কারণ সরকারই সবকিছুর চিন্তাভাবনা করবে এটাই সবার মনে বসে গিয়েছে। এই মানসিকতার পরিবর্তন সর্বাগ্রে করার আবশ্যকতা আছে। যদি শাসক এর জন্য চিন্তাভাবনা না করে তবে কে এই চিন্তাভাবনা করবে এটাও নিশ্চিত করতে হবে। পরম্পরার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে এই চিন্তাভাবনা শিক্ষকগণই করেছেন এবং সমাজ তাঁদের সহযোগিতা করেছে। বেদকালের বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ঋষি থেকে দুই অথবা আড়াই হাজার বছর আগে চাণক্য পর্যন্ত এর উদাহরণ। এরা আচার্য ছিলেন, ঋষি ছিলেন। তাঁরা ধর্মকে জানতেন এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে দিগ্‌বিজয়ী ছিলেন। তাঁরা মুক্তির পথের কথাই বলতেন, তাছাড়া যুদ্ধও করতেন, রাজনীতিও করতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অধ্যাত্ম, ধর্মযুদ্ধ, রাজনীতি, সংগীত, যোগ, অধ্যাপনা ধর্মোপদেশ ইত্যাদি সবার আদর্শ স্থাপনকারীই ছিলেন। আজও শিক্ষাকগণকেই এর প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং সমাজের সহযোগে শিক্ষাকে সমাজের জন্য বাস্তবোপযোগী করে তুলতে হবে।

বারবার বলা হয়ে থাকে যে, শিক্ষার ভারতীয়করণ করতে হবে। এটাও বলা হয়ে থাকে যে এই কাজ শিক্ষকগণকেই করতে হবে। কিন্তু পরিকল্পনা না করে এই কাজ হতে পারে না।

এর কিছু ধাপ এরকম হতে পারে—

১। সর্বপ্রথম শিক্ষগণকে চাকরির ব্যবস্থা থেকে বাইরে বের হয়ে যেতে হবে।

২। সমাজকে অর্থোপার্জনের জন্য চাকরি না করা শেখাতে হবে।

৩। অর্থার্জনের নিমিত্ত ভৌতিক বস্তুর উৎপাদন করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

৪। ভারতীয় সমাজের নিয়ন্ত্রক হচ্ছে ধর্ম। ব্রিটিশ রাজের কারণে এটা অর্থে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ধর্মকে পুনরায় নিয়ন্ত্রক করতে হলে ধর্মাচার্য এবং শিক্ষকগণকেই ভিত্তি করতে হবে। ধর্মাচার্য ও শিক্ষক – দুজনে মিলেই সমাজের সহযোগে শিক্ষার একটা ভারতীয় কাঠামো তৈরি করবেন যা সমাজেরই সহযোগিতায় দাঁড়িয়ে থাকবে।

৫। শিক্ষার যে কাঠামোই তৈরি হোক তাতে আর্থিক স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে হবে। কেবলমাত্র শিক্ষার কাঠামো দিয়ে কাজ হবে না।

৬। অর্থকরী শিক্ষাকে উৎপাদনের সঙ্গে আর্থিক ক্ষেত্রকে জুড়তে হবে।

৭। মানুষের রোজগার আজ যে বয়সে নিশ্চিত হয়ে থাকে তার চেয়েও বরং শীঘ্র নিশ্চিত হয়ে যায় এমনটা করতে হবে। যদিও প্রত্যক্ষ অর্থ উপার্জন আইন অনুযায়ী আঠারো বছরেই হয়। অর্থ উপার্জনের যোগ্যতা কমপক্ষে দশ বছর আগেই নিশ্চিত হয়ে যাওয়া প্রয়োজন ছিল। আঠারোবছর পর্যন্ত যোগ্যতা নির্মাণ না করা অত্যন্ত অব্যবহারিক। বড়ো শিল্পপতিদের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য ধর্মাচার্যদের বোঝাতে হবে।

৮। সরকারের সহায়তা, বিকেন্দ্রিত উৎপাদন এবং আর্থিক স্বাধীনতার ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠার জন্য পরিকল্পনা করতে হবে। আজকে শিক্ষা ও অর্থব্যবস্থা দুটোই সরকারের দায়িত্বে পরিণত হয়েছে। সরকারের নিজের গ্রহণযোগ্যতার জন্যও অর্থপুরুষার্থকে সমাজভিত্তিক তৈরি করার দিকে যত্নশীল হতে হবে।

৯। সাধারণের কাম-পুরুষার্থকে ব্যবস্থিত করা সাধু-সন্তদের কাজ। তাঁদের একাজ করতে হবে।

১০। জ্ঞান ও ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য সাধু, সন্ত, সন্ন্যাসীদের নিজের তপশ্চর্যার পুণ্যফল অন্যদের দিতে হবে। তপশ্চর্যার পুণ্য ছাড়া মহত্ত্বপূর্ণ কাজ সিদ্ধ হয় না।

১১। দেশে যে রকম ধর্মীয় সংগঠন চলেছে সেইরকম শৈক্ষিক সংগঠনও চলছে। দুই প্রকারের সংগঠনকেই সরকার মুখাপেক্ষী বানানোর পরিবর্তে সমাজ মুখাপেক্ষী করতে হবে এবং সমাজকে আর্থিক দায়িত্ববোধের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

১২। যে সমাজ আর্থিক দৃষ্টিতে স্বাধীন ও সমৃদ্ধ নয়, তার সংস্কৃতি ও উত্তম গুণাবলী নাশ হয়ে থাকে। স্বাধীনতা প্রথমে হৃদয়ে ও পরে প্রয়োগে আনতে হবে।

১৩। শিক্ষা পরিবার ব্যবস্থাকে অধিক সার্থক বানাতে সহযোগিতা করবে। এই দৃষ্টিতে সাধুসন্তরা শিক্ষাবিদ্‌দের সহযোগিতা করবেন। সমাজকে স্বাধীন বানানোর শুরু পরিবারকে স্বাধীন বানানোর মাধ্যমে করতে হবে।

১৪। আজকে যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা দৃঢ় হয়ে গিয়েছে তার স্থানে পরিবারকেন্দ্রিক ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, অর্থার্জন ইত্যাদির কেন্দ্র হবে পরিবার। সাংস্কৃতিক একক

এবং আর্থিক একক একসঙ্গে হোক এবং একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকে এমনটা করা দরকার।

১৫। দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজ ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে গবেষণা ও গবেষক নির্মাণ করতে হবে। সন্ন্যাসী ও সমর্পিত প্রাণ শিক্ষিত ব্যক্তিদের অধ্যয়নের পরিকল্পনায় লাগাতে হবে। বাণপ্রস্থী লোকেদের এটা সামাজিক দায়িত্বও বটে। আজ সেবা নিবৃত্তির পরও যে ব্যক্তি অর্থোর্জন করে থাকে তা থেকে তাদের নিবৃত্ত করে এই কাজে লাগাতে হবে।

সংক্ষেপে শিক্ষার সামাজিক প্রয়োজন কেবল চিন্তনের বিষয়ই নয়, কর্মের বিষয়ে পরিণত করতে হবে। এটা যদি কর্মের বিষয় না হয় তবে আগের দুই প্রয়োজনও পূর্ণ হতে পারে না।

ব্যক্তিকে সমর্থ করে তোলা

বর্তমানে সমস্ত শিক্ষা পদ্ধতি ব্যক্তির জন্যই হয়ে চলেছে। মানুষের জীবনযাত্রার জন্য অর্থের আবশ্যকতা থাকে। অর্থার্জনের জন্য মাধ্যম প্রয়োজন। এজন্যই খুব কম বয়স থেকেই তাকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পনেরো-কুড়ি বছর তার অধ্যয়ন চলে। সে অর্থার্জনের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে এমনটা মানা হয় কিন্তু অর্থার্জন করতে পারে এমনটা হয় না। একদিকে তার কাছে শংসাপত্র থাকা সত্ত্বেও অথার্জন হেতু বাস্তবিক ভিত্তি তার মাঝে থাকে না। দ্বিতীয়ত, অর্থার্জনের সুযোগও পরিকল্পিত ব্যবস্থা না থাকার কারণে পায় না। শিক্ষার আলোচনা হলেই শিক্ষাবিদরা সর্বাগ্রে বলেন যে, শিক্ষা জ্ঞানার্জনের জন্য হয়ে থাকে, অর্থার্জনের জন্য নয় কিন্তু বাস্তবে অর্থার্জনের লক্ষ্যেই পরিকল্পনা করা হয়। অবস্থা এমন যে, না হয় অর্থার্জন আর না হয় জ্ঞানার্জন। মাঝখানে জীবনের অমূল্য বছর ব্যর্থ হয়ে যায়।

আজকের শিক্ষা ব্যক্তির জন্য এই কারণে যে আমরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন ব্যবস্থাকে স্বীকার করে চলে থাকি। বাস্তবে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিবারকে একক মনে করে, ব্যক্তিকে নয়। ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যবস্থা স্বীকার করার কারণে ব্যক্তিকে অর্থার্জন , ব্যক্তির বিকাশ ও জীবিকাকেই প্রাথমিকতা দেওয়া হয়ে থাকে। এর থেকেও বড়ো বড়ো সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। মুখ্য সমস্যা হলো, যে ব্যক্তিকে কেন্দ্রে রাখা হয় সেই সবচেয়ে বেশি সংকটে পড়ে যায়। সঙ্গে সমাজও তো সংকটে পড়েই। তারপর ব্যক্তিকে নিয়েও শিক্ষার বিচার করতে হবে। দেশ দুনিয়ার যে অবস্থাই আমরা চাই না কেন তাকে পাবার জন্য ব্যক্তিকে পুরুষার্থ সন্ধান করতে হয়। ব্যবস্থা পরিবারকেন্দ্রিক হয়ে থাকে, ভাবনা অধ্যাত্মনিষ্ঠ হয়ে থাকে, ব্যবহার আত্মীয়সুলভ হয়ে থাকে কিন্তু পুরুষার্থ ব্যক্তিকেন্দ্রিকই হয়ে থাকে। সমর্থ রাষ্ট্র ও সুন্দর বিশ্বের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সমর্থ ও সজ্জন হতে হয়। শিক্ষার স্বরূপ ব্যক্তিকে সমর্থ ও সজ্জন নির্মাণকারী হওয়া উচিত। ব্যক্তিকে সমর্থ ও সজ্জন বানাতে কিছুটা এরকম শিক্ষার কথা ভাবতে হবে ঃ

প্রথমত, তার চিন্তাভাবনা পালটাতে হবে। জগৎ হচ্ছে আমার জন্য আর আমি তাকে আমার সুখস্বাচ্ছন্দের জন্য ব্যবহার করতে পারি এই মানসিকতা তাকে ত্যাগ করতে হবে। সেই স্থানে আমি এই জগতের জন্য এবং আমার সামর্থ্যের ব্যবহার জগতের মঙ্গলার্থে করতে পারি এজন্য আমাকে সামর্থ্য অর্জন করতে হবে—এমন ভাবনা তাকে দিতে হবে।

সুখ লাভ করা প্রত্যেক মানুষের লক্ষ্য। এজন্য প্রত্যেক ব্যক্তিই তা লাভ করতে পুরুষার্থ করাই উচিত কিন্তু পঠনকারী ব্যক্তিকে এটা বোঝানো দরকার যে নিজের আশেপাশের লোকেদের সুখের বিচার না করে নিজের সুখ কখনও প্রাপ্ত হতে পারে না। এমন ইচ্ছা কখনও পূর্ণ হতে পারে না। এতে ওই ব্যক্তির এবং অন্যান্যদের দুঃখ কষ্ট বেড়ে যায়।

মানুষ সুখ চায় তাতে খারাপ কিছু নেই। কিন্তু সুখ কী তা বোঝা দরকার। কেবল খাওয়াদাওয়া ও ইন্দ্রিয়ের উপভোগেই সুখ নেই । মানুষ কেবল শারীরিক ও মানসিক সুখ দ্বারা সন্তুষ্ট হয় না। সে আত্মিক সুখের ততটাই কামনা করে যতটা ইন্দ্রিয় সুখের করে। এই সুখ কীভাবে লাভ করা যায় তা তাকে শেখানো দরকার।

মানুষের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে মোক্ষ। আজ মোক্ষ সংজ্ঞার ব্যবহারও হয় না। তাকে লক্ষ্যে পরিণত করা আর বোধগম্য হওয়া তো অনেক দূরের কথা।

মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করতে হয়। সে ব্যক্তিরূপে তো যুবক বা বৃদ্ধ, সুন্দর অথবা কুরূপ, বুদ্ধিমান অথবা বুদ্ধিহীন বলবান অথবা দুর্বল। এই ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করে তাকে ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু সম্পর্কে সে কারও ভাই, কারও পতি, কারও পিতা আবার কারও পুত্র হয়ে থাকে। অন্য আরও অনেক সম্পর্ক রয়েছে। এই সব সম্বন্ধের কারণে তার অনেক কর্তব্য ও অধিকার থাকে। একেও সম্যকরূপে জেনে ব্যবহার করা উচিত। সমাজে সে একজন ব্যবসায়ী হতেপারে। তার জন্যও তাঁর অনেক দায়িত্ব থাকে। একজন নাগরিকরূপে সে একজন ভারতীয়। তার ভারতীয় হবার দরুন যে আচরণ করা উচিত তা স্বাভাবিক ভাবেই আশা করা হয়। এই আচরণ শেখানোও শিক্ষারই কাজ।

সৃষ্টির যে জীবজগৎ, বনস্পতি জগৎ, পঞ্চমহাভূত রয়েছে সেগুলির সুরক্ষা মানুষের থেকে পাওয়া উচিত। তারা মানুষ দ্বারা ভীতসন্ত্রস্ত না হয় তাতেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। আমি শ্রেষ্ঠ তাই আমি সবাইকে বশ করব এমনটা নয়, বরং আমি শ্রেষ্ঠ তাই সবাইকে রক্ষা করব এমনটাই তার ভাবা ও ব্যবহার হওয়া উচিত।

ব্যক্তিকে সমর্থ করে তুলবার অর্থ হচ্ছে তার নিজের মনকে বশে রাখবার শক্তি থাকা চাই। নিজের ইচ্ছাশক্তিকে বলশালী করলেই কার্যসিদ্ধি হয়ে থাকে এটা ব্যক্তির বোধগম্য হওয়া উচিত। স্বামী বিবেকানন্দ মন সম্বন্ধিত দুটি শক্তির কথা বলেছেন। এই দুই শক্তি হলো একাগ্রতা ও ব্রহ্মচর্য। এই দুটোই সামর্থ্য বৃদ্ধিকারী

শক্তি। এই দৃষ্টিভঙ্গির পাঠ্যক্রম হওয়া উচিত।

মানুষের বুদ্ধিপূর্বক আচরণ করা উচিত। তার বুদ্ধির বিকাশ ঘটানো উচিত। নিজের বুদ্ধিতে ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উন্মোচন করবার ক্ষমতা তার মধ্যে আছে। শিক্ষার মাধ্যমে তার বিকাশ হওয়া চাই। পূর্বে বলা হয়েছে তদনুসারে সমাজ ধারণার জন্য আবশ্যক শাস্ত্রের রচনা করা এবং শাস্ত্রানুসার প্রত্যক্ষ ব্যবহার করাই হচ্ছে বুদ্ধিপূর্বক ব্যবহার। স্বয়ং শাস্ত্রের রচনা করা এবং অন্যদের করা রচনা বোঝাটা হচ্ছে এর কাজ। এমন বুদ্ধির বিকাশ শিক্ষার মাধ্যমে হওয়া উচিত।

স্বাধীনতা হচ্ছে প্রত্যেক মানুষের আজন্ম অধিকার। শারীরিক, মানসিক , বৌদ্ধিকের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও আর্থিক স্বাধীনতা পাবার জন্য এবং প্রাপ্ত স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার জন্য তার উপযুক্ত হওয়া দরকার। কিন্তু একা নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করা উচিত। সবার স্বতন্ত্র সত্তার কার্যকুশল হাতের ব্যবহার করে মানুষকে অনেক বস্তুর এবং কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতাকে ব্যবহার করে অনেক কলাকৃতির সৃজন করা উচিত। সাহিত্য, সংগীত, কলা ইত্যাদি হচ্ছে প্রতিভার ক্ষেত্র। তাঁকে এই ক্ষেত্রেও প্রবীণে পরিণত করা শিক্ষার কাজ।

মানুষ হচ্ছে আধ্যাত্মিক সত্তা। এর অনুভূতি পর্যন্ত পৌঁছানোও তার লক্ষ্য হওয়া উচিত। সাধনা করতে শেখানোও হচ্ছে শিক্ষারই কাজ।

সংক্ষেপে সমর্থ মানুষ দ্বারাই অবশিষ্ট সমস্ত প্রয়োজন লাভ হতে পারে এই কথাকে স্বীকার করে শিক্ষার পরিকল্পনা করলেই সমাজ ও সংস্কৃতি বিকশিত ও সমৃদ্ধ হতে পারে। শ্রেষ্ঠ সমাজ সুসংস্কৃত ও সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। শ্রেষ্ঠ সমাজের অঙ্গরূপে ব্যক্তি অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স লাভ করতে পারে। এভাবে শিক্ষার প্রয়োজনের বিচার সমগ্রতায় করা উচিত। বর্তমান স্থিতি থেকে এটা সম্পূর্ণ বিপরীত।

কিন্তু কেবল আজকের স্থিতি থেকে বিপরীত বলে তা অনুচিত ও অব্যবহারিক হয়ে যায় না। তাকে ভালোভাবে বুঝে ব্যবহারিকে পরিণত করার পরিকল্পনা করাটা আকাঙ্ক্ষিত। শিক্ষার অভারতীয় ভাবনা দূর করে যদি ভারতীয় স্বরূপ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হয় তবে ব্যাপক প্রয়াস করতে হবে। এটা কেবল পর্যালোচনার বিষয় নয়, পর্যালোচনাকে ব্যবহারিকে পরিণত করতে কৃতিরও বিষয় বটে। অনেক সংস্থা ও সংগঠন মিলে করা দরকার এমনটাই হচ্ছে এই কাজ। কোথাও আপোশ না করে মূলে গিয়ে ছোটো ছোটো কথাকে গুরুত্ব দিয়ে করার মতো হচ্ছে এই কাজ। আজ আপোশ করার প্রবণতা খুব বেশি দেখা যাচ্ছে। তাকে মন থেকে ছাড়তে হবে। ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা যদি ঠিক হয়ে যায় তবে কেবল ভারতেরই নয় বরং সম্পূর্ণ বিশ্বের লাভ হবে।

(ভাষান্তর ঃ সূর্যকান্ত গুপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক)

With Best Complinets from -

A

Well Wisher

দূষণমুক্ত পৃথিবীই ‘বসুন্ধরা দিবস’ পালনের উদ্দেশ্য

সরোজ চক্রবর্তী

বিশ্বব্যাপী ২২ এপ্রিল দিনটিকে ‘বিশ্ব বসুন্ধরা দিবস’ হিসেবে পালন করা হয়। এই দিনটি পৃথিবীমাতার সম্মানে উৎসর্গ করা হয়েছে। প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং পৃথিবীকে নিরাপদ বসবাসযোগ্য রাখতে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দিনটি পালন করা হয়। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘অঙ্গীকার’ কবিতাটি আজও প্রাসঙ্গিক। কবি লিখেছেন— ‘এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি, নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার’। কবির এই অঙ্গীকার চিরন্তন। এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তোলার দাবিতেই বিশ্বজুড়ে পালিত হয় ‘বসুন্ধরা দিবস’।

সানফ্রান্সিস্কোতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো সম্মেলনে শান্তিকর্মী জন ম্যাককনেল ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীমায়ের সম্মানে একটা দিন উৎসর্গের জন্য প্রস্তাব করেন। পৃথিবীমাতার জন্য উত্তর গোলার্ধে বসন্তের প্রথমদিন হিসেবে ২১ মার্চ দিনটি পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ১৯৭০ সালে মার্কিন সিনেটর গেলর্ড নেলসন ও ডেনিস হেইসের উদ্যোগে প্রতি বছর ২২ এপ্রিল দিনটি ‘বসুন্ধরা দিবস’ হিসেবে পালন করা হয়। বিশ্বের মোট ১৯২ দেশে এই দিবস পালিত হয়।

২০০৯ সালে জাতিসঙ্ঘের ৬৩তম অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ইকোলজিক্যাল চাহিদার মাঝে ভারসাম্য অর্জনের জন্য প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সুসঙ্গতিতে সহায়তা করা এবং পৃথিবীর ইকো-সিস্টেমকে রক্ষা করা এবং বিশ্বকে দূষণমুক্ত ও সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্যই এই দিবস পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কারণ এই

পৃথিবীতে শুধুমাত্র মানুষ থাকে না। মানুষ ছাড়া এই পৃথিবী আরও নানান প্রজাতির জীবজন্তু ও উদ্ভিদের বাসস্থান। সেই কারণে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলাই এই দিবস পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এখন প্রাকৃতিক দুর্যোগে জর্জরিত। এমন প্রেক্ষাপটে প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে পৃথিবীকে নিরাপদ রাখতে ‘বসুন্ধরা দিবস’ উদ্‌যাপনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন শান্তিদূত জন ম্যাককনেল। পৃথিবী জুড়ে পরিবেশ নিয়ে চিন্তাভাবনা, পরিবেশের নানাবিধ সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য জনগণের মধ্যে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

সম্প্রতি মানবজীবন কঠিন ও অভাবনীয় সত্যের মুখোমুখি হয়েছে ‘করোনা ভাইরাস’-এর দৌলতে। পৃথিবীমাতা নিজেই সক্রিয় হয়েছে দূষণমুক্ত পরিবেশ তৈরির জন্য। তাই ‘করোনা ভাইরাসে’র মতো একটি ভয়ংকর ভাইরাসকে মানবসমাজে হাজির করিয়ে আধুনিক উচ্ছৃঙ্খল, বেহিসেবি প্রযুক্তি-নির্ভর দূষণ সৃষ্টিকারী মানবজাতিকে শিক্ষা দিতে চাইছে। যানবাহন, মানুষের ভিড় সবকিছুকে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে বন্ধ করেছে। মানবজাতির উন্মত্ততাকে থামিয়ে দিয়ে পরিবেশ ও প্রকৃতিকে দূষণমুক্ত করেছে। শুধুই উন্নতির জন্য উন্নতির মত্ততা ও বিশ্বের বিত্তবান শ্রেণীর একপেশে ভোগবাদী জীবনযাত্রা এবং বস্তুবাদী সংস্কৃতির বিশ্বায়ন প্রাণ ও প্রাণী সম্পদকে এমন ভাবে ব্যবহার করে এসেছে, যা থেকে জন্ম নিয়েছে জীবনের বিপক্ষে নিয়ত যুদ্ধের মানসিকতা। মানুষের পরিচয় আজ এক বিপুল সম্ভাবনাময় ক্রেতা সম্প্রদায়। মূল্যবোধহীন জীবনযাত্রার পরিণতি রূপে। উপকরণের প্রাচুর্যের প্রকোপে বিদ্ধ, পৃথিবীর বৃহত্তম সম্পদভোগী দেশগুলি এখন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে কোনও সমাধান দিতে পারছে না, তারা অসহায়। লাগামছাড়া প্রয়োজন মেটাতে অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদন করতে হয়েছে প্রধানত দুটি কারণে--- এক, ভোগবাদী জীবনযাপনের জন্য এবং দুই, পৃথিবীতে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য। এই বিপুল জনবিস্ফোরণের চাহিদা মেটাতে শুরু হয়েছে সামঞ্জস্যহীন উদ্‌যাপন। এর ফলে যে বিপুল ক্ষতিকারক বর্জ্য পদার্থের সৃষ্টি হয়, যা প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীবজগতের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। বর্তমানে অতি উন্নত দেশ এবং অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলি প্রায় সকলেই এই বিষয়ে কম-বেশি দায়ী। পৃথিবীতে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণে রাসায়নিক জঞ্জাল জমে এবং মারাত্মক ক্ষতিকারক গ্যাসীয়, তরল, কঠিন রাসায়নিক যৌগগুলি বিস্তৃত হয়ে দ্রুত পালটে দিচ্ছে আবহাওয়া, জীব গঠন এবং ভবিষ্যতের পৃথিবীকে।

এই গভীর সংকটকালে সুস্থ জীবনযাত্রার পথ খুঁজতে ‘বসুন্ধরা দিবস’ পালনের সিদ্ধান্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভোগবাদ ও ক্রেতা সংস্কৃতির থেকে দূরে এসে পরিবেশ রক্ষার দিকে নজর দেওয়ার জন্যই বিশ্বব্যাপী এই উদ্যোগ। একটা সুষ্ঠু ও সুন্দর পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে এই প্রচেষ্টা। ▯

কার্যকর্তা নির্মাণের কারিগর দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজী

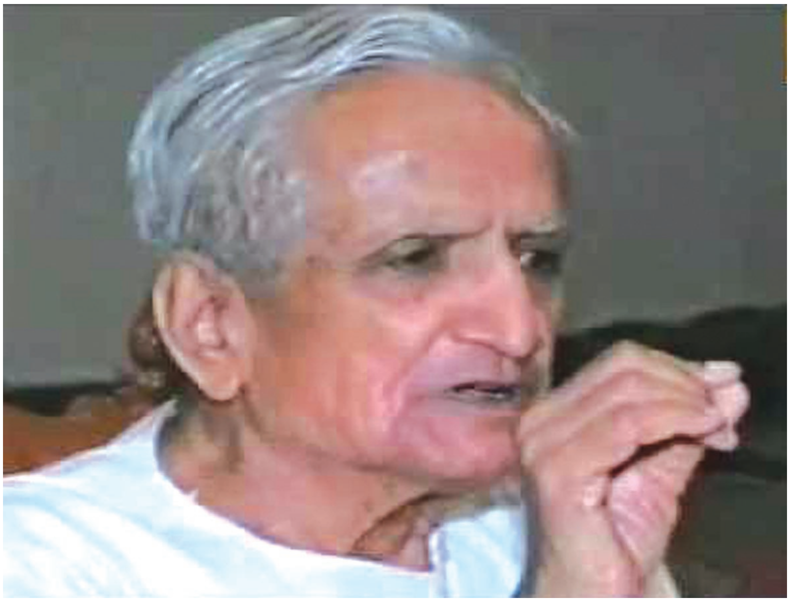

কল্যাণ চক্রবর্তী

অল্প বয়সে দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজী গাঁয়ের কয়েকজন বন্ধু মিলে এক কৃতিবিদ্য গুরুজীর কাছে কুস্তি, লড়াই আর লাঠিখেলা শিখতে যেতেন। আখড়াটি পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে খুবই বিখ্যাত ছিল। অতি দ্রুত তারা খুবই পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন শরীরচর্চার নানান আঙ্গিকে। কিন্তু প্রতিদিন ফেরার সময় তারা লড়াইয়ের পোশাক পরে, ঢিণ্ডোরা পেটাতে পেটাতে, সোজা পথের বদলে আশেপাশের গ্রাম ঘুরে, নিজেদের জাহির করে তবে সদলবলে ফিরতেন। একদিন পাশের গাঁয়ের এক দোকানদার তাদের ডেকে বললেন, 'বাবা, তোমরা সোজা পথ ধরেই তো ফিরতে পারো, শুধু শুধু আমাদের গ্রাম ঘুরে যাও কেন? রোজ কি তোমরা বীরত্ব দেখাতে চাও? কিন্তু তোমাদের গুরু, যিনি এলাকায় সবচেয়ে বিখ্যাত কুস্তিগির, তিনি তো তোমাদের শিখিয়ে-পড়িয়ে চুপচাপ মাথা নীচু করে চলে যান, তারপর তাড়াতাড়ি স্নান সেরে আখড়ার লালপোশাকটিও ছেড়ে ফেলেন। আসলে জ্ঞানের গভীরতা তোমাদের কম বলেই তোমাদের ব্যক্তিগত গর্ব তৈরি হচ্ছে! তোমাদের গুরুজীর জ্ঞানের গভীরতা বেশি বলে, তার মধ্যে কোনো গর্ব নেই, বরং সকলের প্রতি নিষ্কাম কর্ম আছে। সম্পূর্ণ শিক্ষা হয়ে গেলে, তার ভেতরে গর্ব থাকে না, দেখনদারি থাকে না। তোমাদের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা ভাবে গর্ব আছে। ব্যক্তিগত গর্ব ভালো নয়।'

নিজের জীবন থেকে ঘটনাটি বিবৃত করে ঠেংড়ীজী বলছেন, 'কোনো ব্যক্তির নিজস্ব গর্ব তার জ্ঞানের দীনতাকে প্রকাশ করে; যার জ্ঞান ও অভ্যাস যত গভীর, তার গর্ব ততই কম হবে। গর্ব যখন একের থেকে বহুর মধ্যে চলে যাবে, তখনই তৈরি হবে সংগঠন। আমি নই, আমরা। যখন আমার দর্শন আমার গর্ব, তখন তাতে কোথাও একটা দম্ভের ব্যাপার আছে। যখন আমার গর্ব আমাদের দর্শন হয়ে দাঁড়ায়, তকনই তৈরি হয় সংগঠন। গর্ব ভালো, সেটা হলো সমষ্টির গর্ব। 'ম্যাঁয়' না বলে 'হাম' বলার গর্ব, ওটাই সংগঠন তৈরির চাবিকাঠি। যখন আমি আমাদের কোনো বিষয় নিয়ে গর্ব করি, তখন তা হয়ে ওঠে সুন্দর একটি সংগঠন। সংগঠনে We feeling বড়ো কথা।' এভাবে দত্তপন্তজী সংগঠনের সংজ্ঞা দিয়েছেন।

ঠেংড়ীজী বলছেন, সংগঠনের শক্তি সংগঠনের মোট সদস্যের ব্যক্তিগত শক্তির যোগফলের সমান হবে, এমন কোনো কথা নেই। সংগঠনের একটা নিজস্ব ক্ষমতা থাকে, নিজস্ব শক্তি থাকে। যখন আমি আমাদের নিয়ে গর্ব করছি, তখন আমাদের একটি সাংগঠনিক ক্ষমতা তৈরি হয়, তা মাপা অত সহজ ব্যাপার নয়। সংগঠনের একজন সদস্যের কতটা ক্ষমতা, সেটা কখনও পরিমাপ করা যায় না। বিশেষ সময়ে ব্যক্তি বিশেষের ক্ষমতা, বিশেষ রকমের হয়। কোনো কোনো পরিস্থিতিতে কোনো ব্যক্তির ক্ষমতা অনেকগুণ বেড়ে যেতে পারে। কী শর্তে, কী মনোভাব নিয়ে, কী পরিস্থিতিতে কোনো সদস্য কাজ করছেন, তার উপর তার ক্ষমতা কমতে বা বাড়তে পারে। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ঠেংড়ীজী তাঁর পরিবারের একটি ঘটনা বললেন। তাঁর এক নিকট আত্মীয় খুব ধনী পরিবারের একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। নববধূ একেবারেই রান্নাবান্নার কাজে পটু ছিলেন না। তখনকার দিনে উনুন জ্বালিয়ে রুটি করতে হতো। তা করতে গিয়ে সামান্য একটু গরম রুটির ছেঁকা লাগলে তিনি 'উফ্-আফ্' করতেন। এই নিয়ে বাড়ির সবাই রীতিমতো মজা করতেন তার সঙ্গে। একদিন তাদের বাড়িতে আগুন লেগে গেল, তখন গভীর রাত। পাড়ার লোকেরা তাদের ঘুম ভাঙিয়ে জাগালেন। ঘুম ভেঙে পড়ি কি মরি করে সেই বধূ ছুটে বেরিয়ে এলেন। এসেই মনে পড়লো বাড়ির দোলনায় ছোট্ট শিশু ঘুমোচ্ছে। তৎক্ষণাৎ তিনি ওই আগুনের মধ্যে ফের বাড়িতে ঢুকে পরপর দুটো ঘর অতিক্রম করে তৃতীয় ঘরে গিয়ে দোলনা থেকে শিশুটিকে কোলে করে ফিরলেন। শিশুটি প্রাণ পেলো। তবে তিনি ফিরে আসার পর জ্ঞান হারালেন, চিকিৎসায় পরে সুস্থও হয়ে উঠলেন। দত্তপন্তজী বলছেন, যে মানুষটা আগুনের তাপে সামান্য ছেঁকা লাগার জন্য এত ব্যথা পেতেন, তিনিই কিনা অগ্নিকাণ্ডের বিশেষ পরিস্থিতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আপন সন্তানের প্রাণ বাঁচাতে। অর্থাৎ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়ে বা কমে যায়। প্রত্যেক সদস্যের একটা নির্দিষ্ট স্টাইল থাকে। সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয় না। যে যে-কাজটি করতে সবচাইতে সক্ষম, তাকে দিয়ে সেই কাজটিই করাতে হবে। সেটি সংগঠনের কার্যকর্তাকে বুঝতে হবে; এটাই নেতৃত্বের বড়ো গুণ। □

বুদ্ধিজীবী সংজ্ঞার নতুন ধাপ

হিরণ্ময় ব্রহ্মচারী

ইদানীংকালে যে কোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে একটা নতুন গোষ্ঠী কিছু প্লাকার্ড হাতে বুদ্ধিজীবীর বর্ম পরে মিছিল মিটিং করে চলেছেন। সঙ্গে মিডিয়ার দৌলতে তারা বুদ্ধিজীবীর তকমা অর্জন করছেন।

আমরা ছাত্রজীবনে এবং তার পরবর্তীকালে বুদ্ধিজীবী বলতে যাদের সম্পর্কে শুনতাম বা জানতাম বর্তমান বুদ্ধিজীবীদের সংজ্ঞার সম্পূর্ণ ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

বুদ্ধিজীবী বলতে জনমানসে যে সব কবি বা সাহিত্যিক, শিল্পী, ডাক্তার, আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার বোঝায় সেসব বুদ্ধিজীবীদের কোনো সামাজিক অন্যায় ও অনিয়মের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত আন্দোলনে দেখা যায় না। এর একটা বিশেষ কারণও আছে। তা হলো কোনো দলীয় বুদ্ধিজীবী না হলে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা নাও পেতে পারেন। বর্তমানে সমাজে এক নতুন বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব হয়েছে। যে কোনো আন্দোলনেই এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের সর্বাগ্রে দেখা যায়।

প্রথমেই বলে রাখি এই লেখা কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়।

বর্তমানে কোনো আন্দোলনের অগ্রবর্তী ভূমিকায় যে বুদ্ধিজীবীদের দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে মিডিয়ার দৌলতে তাদের কি বুদ্ধিজীবী বলা যায়? যেমন— কলাকুশলী যাঁরা দু-একটি নাটক মঞ্চস্থ করার সুবাদে কিছু ব্যক্তি বুদ্ধিজীবীর তকমা অর্জন করেছেন।

তাহলে সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, উকিল এদের কীভাবে সম্বোধিত করা হবে। সাধারণ মানুষের ধারণা কলাকুশলীদের বুদ্ধিজীবীর তকমা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। এদের যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে বলছি বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে এদেরকে এক পঙ্‌ক্তিতে বা এক আসনে স্থলাভিষিক্ত করা আদৌ সমীচীন নয়? পক্ষান্তরে ফিল্ম ডিরেক্টরে যারা কলাকুশলীদের ঘষে মেজে নায়ক-নায়িকা, ভিলেন বা শিল্পী তৈরি করেন তাদেরকে কী বলা হবে। একজন ফিল্ম ডিরেক্টর অনেক চরিত্র চিত্রায়ন করার ব্যাপারে যে কোনো কলাকুশলীর চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ এবং বুদ্ধিজীবীর আঙিনায় এক পঙ্‌ক্তিতে বা এক আসনে সমাসীন হলে বা করলে অত্যুক্তি বা অতিশয়োক্তি হবে বলে মনে হয় না। তবে নাট্যচর্চাকারী, লেখক বা কোনো দক্ষ শিল্পী (ব্যতিক্রমী) তারা তাদের নিজস্ব স্বমহিমায়, কবিতা, সাহিত্যিক চর্চায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছেন তারা ও বুদ্ধিজীবীর আঙিনায় এক পঙ্‌ক্তিতে সমাসীন হওয়ার নিজস্ব যোগ্যতা অর্জন করেন। তবে কোনো টেলি সিরিয়াল শিল্পী বা কলাকুশলীদের বুদ্ধিজীবী তকমায় ভূষিত করা কতটা সমীচীন সেটা পাঠক সমাজের বিবেচনাধীন। এই কলাকুশীলবরা একটা বিশেষ গোষ্ঠী, এদের বুদ্ধিজীবী না বলে শ্রমজীবী বললে ভুল হবে কি?

তাছাড়া কিছু মিডিয়া রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যক্তিত্বকে বুদ্ধিজীবীর আঙ্গিনায় অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগী হয়েছেন। তাদের ব্যক্তিগত জীবনের ঠিকুজী বুদ্ধিজীবীর তকমার পক্ষে জোর সওয়াল করা যায় কি না জানি না, তবে রাজনৈতিক দলের কর্মীদের বুদ্ধিজীবীর তকমায় ভূষিত করা যায় না। তাহলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে বুদ্ধিজীবীর অলংকারে ভূষিত করলে আসল বুদ্ধিজীবীদের অবস্থা কী দাঁড়ায়। তাদের প্রতিবাদী, সমালোচক বা বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কখনই বুদ্ধিজীবীর আঙিনায় ফেলা যায় না।

সমাজ প্রকৃত বুদ্ধিজীবীদের যোগ্য সম্মান দিলে সমাজও উপকৃত হবে। নকল বুদ্ধিজীবীরা ভাবে ও ভাষায় আসল বুদ্ধিজীবীদের পরাস্ত করার অপচেষ্টা বন্ধ করতে হবে। স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে প্রচারমাধ্যম একটু সতর্ক হলে এদের বাড়বাড়ন্ত রোখা যাবে। তা না হলে ভুঁইফোড় বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকবে এবং সমাজ অবক্ষয়ের পথে পরিচালিত হবে।

বিদ্বজ্জন বা গুণীজনদের আমরা কীভাবে সম্বোধিত করবো। তাদের বুদ্ধিজীবী সম্বোধিত করলে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন এবং মর্যাদায় অভিষিক্ত করা যায়। অতএব প্রচার পাওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বুদ্ধিজীবীর তকমায় অভিষিক্ত হলে তার প্রতিবাদ অবশ্যই হওয়া দরকার। তা না হলে যে অপচেষ্টা চলছে তা বন্ধ করা একান্তই জরুরি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বুদ্ধিজীবীর তকমা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। একথাও ঠিক যে রাজনৈতিক ব্যক্তিরাও বুদ্ধিজীবীর আঙিনায় থাকেন— অনেক কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁদেরকে প্রকৃত বুদ্ধিজীবী হিসেবে আপামর জনসাধারণ সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করেন।

আমরা আশা করব যে, এক উন্নত ভারত গঠনের ক্ষেত্রে ফেক্ বুদ্ধিজীবীদের জনসমক্ষে তাদের মুখোশ উন্মোচিত করে শক্তিশালী ভারত গঠন করবেন। কারণ প্রকৃত বুদ্ধিজীবীরা দেশ এবং জাতি গঠনের ক্ষেত্রে সর্ব্বকালেই এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। সমাজবিদ্ ও সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজকে এক উন্নত স্তরে পৌঁছনোর চেষ্টা প্রতিনিয়ত করে চলেছেন। যে কোনো ফেক্ বুদ্ধিজীবী সমাজকে প্রতিনিয়ত প্রতারিত করছেন, দেশ ও সমাজের চরম ক্ষতি করে চলেছেন। সংবাদমাধ্যম বা মিডিয়া বুদ্ধিজীবী সিলেকশনের ব্যাপারে একটু সতর্ক হলে আসল এবং নকলের পার্থক্য বোঝা যাবে এবং ফেক্ বুদ্ধিজীবীদের তফাত করা সহজ হবে। বর্তমানে নকল আসলকে অতিক্রম করার যে অপচেষ্টা চলছে তা বন্ধ করা যাবে এবং সমাজও উপকৃত হবে। ▯